পরিবর্তন

১ ডিসেমবর ১৯৮০



মৃণাল সেনের ২৫ বছর





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ক্যান ঃ সৌম্য ভৌমিক

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


এক-চক্ষু জলদস্যু
মূল কাহিনী : রবিদাস সাহারায়
চিত্র কাহিনী : অলোক দত্ত
শিল্পী : পোলারিস
২৮
ডিঙিগুলি থামলে কোমরে তলোয়ার আর হাতে বন্দুক নিয়ে সবাই নেমে পড়ল।
তোমাদের মধ্যে দুজন এখানে থাক ; আর আমরা সব দ্বীপটার উত্তর দিকে.....
বনের মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর একটা জাহাজ দেখা গেল।
ওইত 'টেরর' জাহাজ।
আমরা কি জাহাজটা এখন আক্রমণ করব ?
ঠিক তাই। এই পাহাড়ের কোন গুপ্ত গুহায় ওরা লুটের মাল লুকিয়ে রাখছে।
যারা মাল লুকোনোর
ব্যস্ত আছে ওদের আমরা প্রথমে আক্রমণ করব।
ক্লাস একটা উঁচু জায়গায় উঠে চোখে
টেলিসকোপ লাগিয়ে চারিদিকটা

সম্পাদকীয়

পেশা ঠাণ্ডা পানীয় বিক্রি। তার থেকেই নাম পানিওয়ালা। দিললির এই পানিওয়ালাকে নিয়ে সুপরিম কোরটে মামলা উঠেছিল। আবেদন করেছিল পানিওয়ালা নিজেই, দিললি পুলিশের বিরুদ্ধে। সুপরিম কোরটের রায় পানিওয়ালার পক্ষেই গেছে।

আসল ঘটনাঃ পানি বিক্রি পানিওয়ালার নেহাৎই সাজানো ব্যবসা। তার আসল কাজ ছিল দিললি পুলিশের হয়ে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। এ পর্যন্ত পানিওয়ালা তিন হাজার মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। সবই পুলিশের হয়ে। শেষ পর্যন্ত কী কারণে পুলিশের সঙ্গে তার খটাখটি বাধে। ব্যস, অমনি পুলিশী হুকুমঃ প্রেমচাঁদ পানিওয়ালাকে দিললি ছেড়ে চলে যেতে হবে কারণ সে নাকি নগরজীবনের পক্ষে ভীষণ মারাত্মক লোক।

পানিওয়ালা পুলিশের আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে যায়। সুপরিম কোরটের বিচারপতিরা সব শুনে থ। তিনজন বিচারপতি ১৪ পাতার রায়ে পুলিশের কাজের কঠোর নিন্দা করেছেন; পানিওয়ালার বহিষ্কার আদেশও বাতিল হয়ে গেছে। বিচারপতিরা বলেছেনঃ পুলিশের কথায় নির্ভর করে আদালত কত নির্দোষ ব্যক্তিকে সাজা দিয়েছেন কে জানে! তাঁরা পুলিশের এই সব জঘন্য ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

চলতি বছরের ১৬ মার্চ দিললিতে পুলিশ মিছিলকারী অন্ধদের বেধড়ক লাঠি-পেটা করে। পুলিশের আচরণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য এক সদস্য বিশিষ্ট এক কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান ডি সি আগরওয়াল তাঁর রিপোরটে বলেছেন— অন্ধদের উপর পুলিশের লাঠি প্রয়োগের যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই ছিল না। তিনি বলেছেনঃ সব ব্যাপারেই পুলিশ বেপরোয়া আচরণ করে—পুলিশ সম্পর্কে আমাদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গেছে দুঃখের কথা—অন্ধদের উপর লাঠি চালনার ঘটনায় ঐ ধারণারই প্রতিফলন ঘটেছে

পুলিশ সম্পর্কে বিচারপতিরা যতই কঠোর মন্তব্য করছেন না কেন, তাতে তাদের চৈতন্য উদয় হবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। অন্তঃস্বত্ত্বা নারীকে প্রকাশ্যে উলঙ্গ করা, তার স্বামীকে সকলের সামনে খুন করা কিংবা দলবদ্ধভাবে গ্রামে গিয়ে মেয়েদের ধর্ষণ করে আসা—এ দেশের পুলিশের পক্ষে এ সবই প্রায় স্বাভাবিক আচরণের পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

একটা স্বাধীন দেশের মানুষ দেশের আইন-রক্ষকদের দেখে ভীতি, ঘৃণা আর অবিশ্বাসের চোখে— এটা কখনোই সুলক্ষণ হতে পারে না। কিন্তু কেন ওরা সাধারণ মানুষ থেকে এত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন? ওদের 'জঘন্য' আচরণ বন্ধ করবেই বা কে? কোন উপায়ে এ প্রশ্নের উত্তর বের করতে আর বোধহয় দেরি করা ঠিক হবে না।

পরিবর্তন

১ ডিসেমবর ১৯৮০
তৃতীয় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা
দাম ১·৫০ টাকা
বিমান মাশুলঃ পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ নিতাই ঘোষ

প্রচ্ছদ আলোকচিত্রঃ চিত্রজিৎ ঘোষ

সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সংযুক্ত সম্পাদক : ধীরেন দেবনাথ
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

ইসলাম ধর্মে মদ ও মৌমাছি

১ নভেম্বর ১৯৮০ পরিবর্তন পত্রিকায় আনোয়ার ইবনে গনি 'ইসলাম ধর্মে মদ ও মৌমাছি' প্রসঙ্গে যে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন তা একাধারে যেমন বিকৃত এবং ভ্রান্ত অপর দিকে তেমনি আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন ও হাস্যকর।

মদ ইসলাম ধর্মে হারাম এ কথা সর্বজন-বিদিত। তিনি কোরাণের সুরা বাকারার ২১৯ আয়াতের যে উল্লেখ করেছেন সেখানে বলা হয়েছে ঃ—"লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও আছে। কিন্তু ওগুলোর মধ্যে উপকার অপেক্ষা পাপই অধিক।" (বাহুল্য এড়াতে মূল আর্বী উচ্চারণ বাদ দেওয়া হল)। এখানে ব্যবহৃত 'খামর' শব্দটির অর্থ শুধু 'খেজুর গাঁজানো তাড়ি নয়,' বরং সমস্ত রকমের নেশা উৎপাদনকারী মদ জাতীয় পানীয়। 'খামর' (Liquor, Alcoholic beverages, In a state of fermentation etc. (১) কোরাণের অন্যত্র মদকে পরিষ্কার ভাষায় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে ঃ—

"হে বিশ্বাসিগণ মদ জুয়া…ঘৃণ্যবস্তু, এসব শয়তানের কাজ, সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হ'তে পারবে।" (আল কুরাণ ৫ ঃ ৯০)।

এই বাক্য অবতীর্ণ হওয়ার সময় মদিনার সমস্ত মুসলিমেরা তাঁদের ঘরে যত মদ জাতীয় পানীয় ছিল রাস্তায় ফেলে দেন। (২)

হাদীস হ'তে অসংখ্য প্রমাণ আছে এবং সেখানে কি কি-বস্তু হ'তে মদ তৈরি হয় তার কিছু নামও উল্লেখ করা হয়েছে। কোন স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যেন না ভাবেন যে উল্লিখিত বস্তুগুলি হ'তে উৎপন্ন মদ ব্যতীত আর সব মদ বুঝি হালাল। স্বয়ং হযরৎ উমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীস ঃ—

"মদ নিষিদ্ধ (হারাম) ব'লে আল্লাহ-র-ওহী (আদেশ) অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা তৈরি হয় পাঁচটি জিনিস হ'তে—আঙ্গুর, খেজুর, যব, আটা ও মধু। মদ এমন জিনিস যা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে।" (সহীহ বুখারী)।

অপর এক বর্ণনায় বাল্যকাল হ'তেই রাসু-খুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘরে লালিত হযরৎ আনাস (রাঃ) বলেন ঃ—"রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মদ প্রসঙ্গে দশ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন,—যে এর রস নেয়, যে রস নিয়ে যাবার জন্য নিযুক্ত হয়, যে এ পান করে, যে বহন করে, যার কাছে বহন করা হয়, যে এ পরিবেশন করে, যে বিক্রয় করে, যে মূল্য গ্রহণ করে, যে এ ক্রয় করে এবং যার জন্য ক্রয় করা হয়।" (তিরমিথি ইবনে মাযাই) প্রবন্ধকার আঙ্গুর ও খেজুর হ'তে উৎপন্ন মদ হালাল হওয়ার সপক্ষে কোরাণ হ'তে (সুরা নাহল্-৬৭ আয়াত) যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা হল ঃ—"এবং খেজুর বৃক্ষ ও আঙ্গুর হতে তোমরা উৎকৃষ্ট পানীয় ও আহার লাভ করে থাক। এতে অবশ্যই চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন আছে।"

এখানে 'সাকারকে' একমাত্র মদ অর্থ নিয়ে তিনি বিভ্রান্ত হয়েছেন। 'সাকার' শুধু মদ নয়, উত্তম পানীয় (Wholesome Drink)। 'সাকার'-Drink, Sweetmeat, Sugar, Sprinkle with Sugar etc. (৩) এখানে খেজুর ও আঙ্গুর হতে যে উৎকৃষ্ট বস্তু Vinegar, Date-Sugar, Grape-Sugar ইত্যাদি তৈরি হয় সেই কথাই বলা হয়েছে, উঁচু দরের মদ বোঝাতে 'হাসানা' শব্দটা ব্যবহৃত হয়নি।

খলীফা আলমামুনের আগে দুশো-বছর ধরে মদ যে হারাম ছিল তার বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিদ্যমান। মুসলীম বীর কবি আবুমেহজান সাকাফী পান-দোষে বহুবার শাস্তি পান, পরে বন্দী হন। কাদাসিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পর পানাভ্যাস ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করেন। হযরৎ উমর ফারুক (রাঃ, নিজের ছেলে আবুসামাকে মদ্যপানের অপরাধে বেত্রাঘাতের আদেশ দেন (৪) পরবর্ত্তীকালে উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খলীফারা কেউ কেউ শরীয়তের প্রকৃত রূপায়ণে অবহেলা করেন, মদ মুসলিম বিশ্বে তখন হতে প্রকাশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ পায়। পরে ইসলাম-বিচ্যুৎ ফাতেমীরা মদ বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেয়। সুতরাং খলীফা আলমামুনের সময় (১৯৩ হিজরী, ৮০৯ খৃঃ) তাঁর "নির্দেশে ইমাম বুখারী প্রথম হাদীস সংগ্রহ করার পরই দেখা গেল মদ হারাম"—এই তথ্য ভিত্তিহীন।

মৌমাছি সম্পর্কে লেখক যা কিছু বলেছেন তা অজ্ঞতা-প্রসুত, সুরা নাহালের ৬৮. আয়াতের উল্লেখ করেছেন ঃ—"তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে ওর অন্তরে ইঙ্গিতের দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন গৃহ-নির্মাণ কর পাহাড়ে, গাছে এবং মানুষের গৃহে।" এখানে প্রবন্ধকার ওহী অর্থে স্বর্গদূত (?) বুঝিয়েছেন। 'ওহী' বিশেষ অর্থে 'স্বর্গীয়-বার্তা' (স্বর্গদূত অবশ্যই নয়)। কিন্তু আর্বী একটা ভাষা বিশেষ, তার কোন শব্দ শুধু একটাই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ওহীর বিশেষ অর্থ স্বর্গীয়-বার্তা ছাড়া আরও সাধারণ অর্থ আছে 'ওহী' To inspire, to reveal, to suggest, give impression (৬) মৌমাছির ক্ষেত্রে এই ওহীর অর্থ সহজাত জৈবিক অনুপ্রেরণা (Vital Instinct)। যেমন বাবুই পাখির বাসা বাঁধা ও বাসায় আলো জ্বালানোর পদ্ধতি (গোবরে জোনাকীর মাথা গুঁজে দিয়ে), মাকড়সার জাল বোনা, পিপীলিকার খাদ্যান্বেষণ, শিশুর জন্মের পর স্তন্যপান এসব সহজাত জৈবিক প্রবৃত্তি বা Vital Instinct বা ওহী। এখানে কোন ফেরেস্তা এসে এ ওহী জানায় না, এ তাদের কেউ শেখায় না, এ আল্লাহ-প্রদত্ত ইঙ্গিত বা ওহী। এ 'ওহী' সে 'ওহী' নয়। তাই ওহী পেয়েও মৌমাছি, বাবুই পাখি, মাকড়সা, পিপীলিকা ও সমস্ত শিশুই নবী নয়। প্রবন্ধকার অজ্ঞতাবশত বিকৃত অর্থে 'ওহী'কে নিয়ে মৌমাছির উপর নবুয়তের দায় চাপিয়েছেন। এখানে তার বক্রোক্তি ধৃষ্টতাযোগ্য।

মধু সংক্রান্ত অদ্ভুত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। সুরা নাহালের ৬৯-আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন—'এর পর পৃথিবীর প্রত্যেক ফসল কিছু কিছু আহার কর··ওর দেহ হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়···এ তোমাদের জন্য ব্যাধির প্রতিকার।' একই ভাবে সামারাতকে শুধু 'ফল' অর্থে নিয়ে তিনি বিভ্রান্ত হয়েছেন। এখানে সামারাত বৃহত্তর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সংকীর্ণ অর্থে ফল বোঝাতে হয়। সামারাত অর্থে পৃথিবীতে উৎপন্ন ফসলাদি (produce of the earth) বোঝানো হয়েছে। 'সামারাত'—Fruit, Fruitage, to bear fruit, gain, profit, benefit, produce of the earth.(৭) সুতরাং সামারাত শুধু 'ফল' (আম, জাম ইত্যাদি) নয়। তাঁর ভ্রান্ত ধারণা আছে মৌমাছি শুধু ফুল থেকেই রস সংগ্রহ করে। এই Pre-supposition থাকার জন্য মহাজ্ঞানী আল্লাহ সামারাত যে বৃহত্তর অর্থে ব্যবহার করেছেন তা বুঝতে পারেননি।

'Although these insects (Honey-bees) thrive best in gardens and forests yet these have been noticed lapping the honey-dew of some plant-bugs and also seeking sugar from places other than flowers'. (৮)

মৌমাছি শুধু পৃথিবীর বুকে উৎপন্ন ফল-ফুল ফসলাদি হতেই রস সংগ্রহ করে না তাকে চাক তৈরির জন্য গাছের ছাল হতে নিসৃত 'গাম' ও 'রেজিন' সংগ্রহও করতে হয়।

'শরাব' মদকেই শুধু বোঝায় না। 'শরাবুন তহুরা' বা পবিত্র পানীয়ের কথা পবিত্র কোরানে উল্লেখ আছে—'তোমার প্রতিপালক স্বর্গবাসীদের পান করাবেন পবিত্র-শরাব (পানীয়)।' (আলকুরান ৭৬ ঃ ২১) সুতরাং মূল পাণ্ডুলিপিতে 'আসলা' ছিল তা পালটে ফেলা হয়েছে একথা 'ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানুষের' ভাবার দরকার নেই। শরাব—Drink, Soak, Saturate, Impregnate etc. (৯)। প্রচলিত আর্বী শব্দ 'আসলা' ব্যবহার না করে কেন শরাব ব্যবহৃত হল তাও অনুধাবনযোগ্য। মৌমাছি যা সংগ্রহ করে আর আমরা যাকে সঞ্চিত অবস্থায় পাই ও মধু বলি দুটো এক জিনিস নয়, বরং আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

মৌমাছি তার Proboscis ও Maxiolabial fold-এর দ্বারা (যাকে প্রবন্ধকার সম্ভবত নল-চঞ্চু বলেছেন) শর্করা-পানীয় (Nectar) বা শরাব সংগ্রহ করে এবং সে তা গিলে ফেলে যা তার উদরস্থিত মধু-থলি (Honey-Stomach or Honey Crop)-তে জমা হয়। শুধু তাই নয় ওর গায়ে যে তথাকথিত মধু লেগে যায় তা ওর Pollen Brush দ্বারা মুছে ওর দেহস্থ Pollen Basket-এ জমা করে বাসায় গিয়ে বের করে তা গিলে ফেলে—সব সঞ্চিত হয় Honey-Stomach-এ। Proboscis-এর ব্যবহার মধু সংগ্রহের জন্য, সঞ্চয়ের জন্য নয়—'The proboscis is used for lapping up fluids especially plant nectar and water'. (১০)

পৃথিবীর বুকে উৎপন্ন এইসব ফসলাদি (সামারাত) হতে সংগৃহীত এই শর্করা-পানীয় (শরাব) মৌমাছির মধু-থলিতে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়। ফল শর্করা সুক্রোজ পরিণত হয় গ্লুকোজ, লেভুলোজ ও ফ্রুকটোজে। 'Within the Crop nectar is Converted to Dilute honey by the action of salivary enzymes. It may then pass back into the proventriculus or be regurgitated either to be stored...The raw honey is concentrated by the evaporation of water'. (১১)

এভাবে পেট (বুতুন Stomach. belly abdomen, interior-১২) হতে যে Dilute honey উদগীরিত (Regurgitated) হল তার তরলীয় অংশ বাষ্পীভূত হয়ে তৈরি হল 'আসলা' বা মধু--'Honey as derived from the beehives is not the actual nectar or sugar bearing secretion of plants.... The insects swallow the nectar and carry in their honey sac or within their honey stomach until they are at their hives where it is regurgitated after Chemical changes.........The 'nectar' (কোরানে উল্লেখিত শরাব) thus ripes and forms 'honey' (প্রবন্ধকারের আসলা) (১৩) এজন্য 'মহাজ্ঞানী, বিশ্বস্রষ্টা সর্বক্রিয়ার কারক আল্লাহ' 'আসলা'-র বদলে 'শরাব' শব্দই অবতীর্ণ করেছেন এবং এর সূক্ষ্মতম পার্থক্যটুকু আমাদের গোচরে আনার সাহায্য করেছেন।

'অশিক্ষিত মরুচরেরা' এত সূক্ষ্ম তথ্য জানবে কি করে যে তারা কোরানে এ অনুপ্রবেশ বা প্রক্ষেপ করবে। বরং বিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধকারের পক্ষেই সম্ভব ভিত্তিহীন তথ্য প্রাণী বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে নির্দ্বিধায় চালিয়ে দেয়া।

সুতরাং আল্লাহ-র ঘোষণাই সত্য, 'এ আমি অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর রক্ষক এতে কিছু প্রক্ষিপ্ত বা এ পরিবর্তিত হয়নি—'কোন মিথ্যাই এর সম্মুখ অথবা পশ্চাত হতে নিকটবর্তী হতে পারে না এতো এমন একজনের দ্বারা অবতীর্ণ যিনি মহাজ্ঞানী সমস্ত প্রশংসার যোগ্য। (আল-কুরান ৪১ : ৪২)।

'মৌমাছির পেট থেকে বিবিধ বর্ণের যে মদ (?) বের হয় এই মতের যিনি প্রবক্তা তাঁর মৌমাছির জীবন গতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব আছে।'—সাবাস! নেহাৎ অপ্রকৃতিস্থ না হলে এমন কথা বলা যায় না। আমাদের গ্রামে-গঞ্জেই মধু বিক্রয় হয় গাঢ়-ধূসর (Dark-brown), পাতলা ধূসর (Light-brown), লালচে (Reddish) রঙের। প্রথমোক্ত দুটি তৈরি করে Apis indica জাতীয় মৌমাছি, Apis florea তৈরি করে দ্বিতীয় প্রকারের মধু। এছাড়া পার্বত্য বনাঞ্চলে Apis Dorsata নামে বড় বড় মৌমাছি (২০ মি মি লম্বা), ৩ ফুট × ৫ ফুট চাক তৈরি করে যা হতে প্রায় ৬০ পাউন্ড মধু পাওয়া যায়, এই মধুর রঙ পাতলা কখন কখনও সাদা। এছাড়া হলুদ (পীতাভ) মধুও পাওয়া যায় (মূলত আন্দামানের চাপলাস ফলের মরশুমে)।

এই প্রসঙ্গে উটের পেটের জল সম্পর্কিত তথ্য অপ্রাসঙ্গিক ও অযথার্থ। (কোরানের ঐ আয়াতের যথার্থতা বুঝতে হলে দেখুন Maurice Bucaille-র La Bible Le Quran et La Science)। মধুর গুণ বর্ণনা করতে তিনি যা বলেছেন তা সত্য। তবে শেষোক্তটি (রমণ ক্রিয়ার সহায়ক) সংস্কারপ্রসূত ধারণা (Layman's Idea) :—

'One pound honey is equal to 3½ pound potatoes or 4½ pound grapes...it can be compared to 365 Mc. g Vit B,...254 Mc. g. Pantothenic acid and 0.60 MG Nicotinic acid. One pound honey contains 5 oz Dextroxse...1 gm Iron, Calcium etc.' (১৪)

উপরি উক্ত বস্তুগুলির দ্রব্যগুণ যাঁর জানা তিনি দাবি করতে পারেন এ রোগের আরোগ্য ও তাপক্রিয়ার সহায়ক। তবে রমণ ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আজগুবি ধারণা সন্দেহ নেই।

'এই দুই আয়াতে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা বিজ্ঞান অথবা ব্যাকরণ সম্মত কিনা তা নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে'—এই কটাক্ষ উক্তির পশ্চাতে এবং 'মৌমাছি ও নবী' এই বক্রোক্তি, মিথ্যে তথ্য পরিবেশন করে মদ হালাল করার চেষ্টা ও সর্বোপরি কোরানের মধ্যে শব্দ প্রক্ষিপ্ত করার ভিত্তিহীন যুক্তি পেশ করে হযরত ওসমান (রা) প্রমুখ সাহাবীদের অভিযুক্ত করার দুর্ধর্ষ পদক্ষেপের পশ্চাতে যে মুনাফেকীর পূর্ণ চরিত্র-চিত্রণ পরিস্ফুটিত তা অকপটে স্বীকার করেই বলছি, আল্লাহ-র বাক্যই সত্য—'এই একই বাক্য দ্বারা কাউকে পথ দেখাই, কাউকে বিভ্রান্ত করি।'

ফারুক ও জামিল, কলকাতা

References

১, ৩, ৬, ৭, ৯, ১২—(1) Arabic to English lexicon by Milton & Cowan, published from Ithaca, Newyark.

(2) Same—by Ilias & A. Ilias, published from U.A.R.

২ — (১) গিরাতুন্নবী — মাওলানা শিবলী নোমানী।

(২) ইবনে হিসাম

(৩) তাফহীমুল কোরান—মাওলানা আবুল আলা মাওদুদী।

৪—(১) হযরত ওমর — আব্দুল মওদুদ।

(২) আশারা মোবাশশারা—মোহাম্মদ গরীবুল্লাহ মসরুর।

(৩) আল ফারুক ও তরকতে ইবনে সাদ।

৫—বিস্তারিত জানার জন্য—(১) Sviours of Islamic spirit Abul Hassan Ali Nadvi (২) মুসলীম দর্শনের ভূমিকা—রশীদুল আলম।

৮, ১৩, ১৪—Invertebrate Zoology—by E L Jordan & P S Verma

১০, ১১—Text book of Zoology—by A. J. Marshall & W D Williams

—॥ ২ ॥—

বর্তমানে সারা বিশ্বে ইসলাম বিরোধী এক ক্লেদাক্ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অনেকেই যেন তেন প্রকারে চায় ইসলামের ভাব মূর্তিকে মুছে দিতে। তারই একটা দিক বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিতর্কমূলক প্রবন্ধ যা জনমানসে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এদের হাতিয়ার এক শ্রেণীর নামধারী মুসলমান। তারা কখনও পীর উপর, কখনও সুদের উপর কখনও নিষিদ্ধ বস্তুর উপর ভুল ব্যাখ্যা বিকৃত উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধ লেখেন তেমনি এক ব্যক্তি আনোয়ার ইবনে গাণি, যিনি 'পরিবর্তন' ১ নভেম্বর পত্রিকায় 'ইসলাম ধর্মে মদ ও মৌমাছি' শীর্ষক প্রবন্ধে ভুল ব্যাখ্যা ও বিকৃত উক্তির ফোয়ারা ছুটিয়েছেন। যে কথা ইসলামের দুষমনরাও বলতে লজ্জা পাবে তা অবলীলাক্রমে বলেছেন।

তিনি প্রথমেই বলেছেন—'ইসলাম ধর্মে মদ হারাম...কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা ইসলামের মূল ধর্মগ্রন্থ কোরআন বহির্ভূত। নবম শতকে বাগদাদের খলিফা আল মামুনের নির্দেশে ইমাম বোখারি প্রথম হাদীস সংগ্রহ করার পরই দেখা গেল মদ হারাম।'

লেখকের এই প্রথম উক্তিটাই সম্পূর্ণ মিথ্যা। মদ হারাম করে কোরআনে অসংখ্য আয়াত আছে। তার থেকে মাত্র দুটি আয়াত দিলাম।

'ইয়াস আলুনাকা আনিল খামরে অল মায়সারে, কুল ফিহিমা ইসমুন কাবির, অমানা ফেয়োলিন্নাস, ওয়া ইয়াসমুহুমা আকবারো মিন নাফয়েহিমা।'

অর্থাৎ 'হে নবী তোমাকে লোকেরা মদ ও জুয়া সম্পর্কে (উহার বৈধতা লাভের দিক সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করছে, তুমি (স্পষ্ট করে) ঘোষণা করে দাও, এই সবের মধ্যে (মদ ও জুয়া) ভয়াবহ অপরিসীম ক্ষতি ও পাপ। মানুষের জন্য যেটি লাভ সেই লাভ অপেক্ষা উহাদের ক্ষতি ও পাপ অতি বিরাট ও বিশাল।' (সুরা বাকারা ২১৯ নং আয়াত)

সুরা মায়েদাহ ৯০ আয়াতে আছে : 'ইন্নামাল খামরো ওয়াল মায়সেরো ওয়াল আনসাবো ওয়াল আযলামো, রিজসুম মিন আমালিশ শায়তান+ ফাজতানি বুহো।

অর্থাৎ মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর, ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানেরই কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর।'

এই হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র থেকে মদ একেবারে বর্জন হয়ে গেল।

এই নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হওয়ার পর কিছু লোক প্রশ্ন তুললেন, অল্প মাদকতাসম্পন্ন ফল ও রস থেকে যেগুলি তৈরি হয়, সেগুলি তো বৈধ রাখা যেতে পারে? আল্লার রসুল এই প্রশ্নের জবাব দিলেন : 'কুল্লু শারাবুন মুস্কেরুন কাদুয়া হারামুন।'

'প্রত্যেকটি নেশাদার পানীয় দ্রব্য হারাম।'

এই প্রশ্নটি মিটে যাওয়ার পর আর একটি প্রশ্ন প্রকট হয়ে উঠল যে অল্প পান করলে ক্ষতি কি? মহানবী মুহম্মদ (সঃ) জবাব দিলেন :

'মা আসকারা কাছিরুহু আওকালিলুহু ফাহুয়া হারামুন।' অর্থাৎ 'যে নেশাদার দ্রব্যের অধিক গ্রহণ করলে জ্ঞান বিকৃত হয় তাহা সামান্য মাত্রায় গ্রহণ করা হারাম।'

পাঠক বুঝে দেখুন নবীর জীবদ্দশায় যে বস্তু হারাম হয়েছে, কোরআন ও হাদিস যার স্পষ্ট প্রমাণ তা কেমন অবলীলাক্রমে বলেছেন।

এর পরবর্তী যুগে যদি কেউ জোর পূর্বক মদকে হালাল করার চেষ্টা করে থাকে তবে তারা গায়ের ইসলামী কাজ করেছেন। এবং তা ইসলাম সম্মত নয়।

নবম শতকে ইমাম বোখারী প্রথম হাদিস সংগ্রহ করেছেন এ একটা প্রলাপোক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। তার আগের অসংখ্য হাদীস সংগ্রহকারীর নামের তালিকা দিলে স্থান সংকুলান হবে না।

এর পরেই লেখক ১৪ নাম্বার সুরা নহলের আয়াত তুলেছেন, কিন্তু

মানে ভুল করা হয়েছে এবং আয়াতটি সম্পূর্ণ লেখেননি। সম্পূর্ণ আয়াতটির মানে হবে

'(এই ভাবে) (আমি আল্লাহ) খেজুর বৃক্ষসমূহ ও আঙ্গুর ফলগুচ্ছ থেকে এক প্রকার রস তোমাদের পান করাই, যা থেকে তোমরা অপবিত্র মাদক দ্রব্য এবং পবিত্র পানীয় তৈরি কর। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে বিবেকবানগণের জন্য নিদর্শন বর্তমান।'

এই আয়াতটি প্রথম স্তরের আয়াত। তখন মক্কার লোক প্রচুর মদ্যপান করত। তবুও নেশাকে অপবিত্র পানীয় বলা হয়েছে কিন্তু লেখক সে কথাটি বেমালুম হজম করেছেন। ব্যাখ্যাকারেরা এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন—'আমি আল্লা মানুষকে পবিত্র পানীয় দান করি যার মধ্যে মানুষের মঙ্গল নিহিত কিন্তু যারা বিবেকহীন তারা সেই পবিত্র পানীয়কে অপবিত্র করে পান করেন।'

লেখক এর পরেই সুরা নহলের ৬৮ ও ৬৯ আয়াতকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন। ভদ্রলোকের সম্ভবত জানা নেই যে কোরআনকে ত্রুটিমুক্ত শাশ্বত সত্য হিসাবে মেনে নিলে তবেই মুসলমান থাকতে পারবেন। শুধু এই বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, কোরআনের ব্যাকরণগত ত্রুটির ইঙ্গিত পর্যন্ত করতেও দ্বিধা করেননি।

চোদ্দশত বর্ষ ধরে কোরআনের ভাব ভাষা সাহিত্য অলঙ্কার সম্বন্ধে মুসলীম অমুসলিম শত শত বিশ্ব বিশ্রুত চিন্তানায়ক মনীষীগণ শতমুখে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, সত্যই কোরআনের ভাব ভাষা ও সাহিত্য মাধুর্যের কোন তুলনা নেই। মানুষ কখনও তার মানবীয় গুণের দ্বারা এই অপার্থিব সাহিত্য ও ভাব মাধুর্য সৃষ্টি করতে পারে না।

সর্বোপরি যার মধ্যে আদৌ আরবী ভাষার জ্ঞান নেই তার লেখনী কোরআনের ত্রুটি বার করা কত বড় ধৃষ্টতা তা চিন্তা করা যায় না। ইনি যে আরবী ভাষা আদৌ জানেন না তার প্রমাণ তিনি 'শারাব' মানে বলেছেন।

শারাব অর্থ পানীয়, মধু, দুধ, ফুল ও ফলের পবিত্র রস ইত্যাদি। এই শারাব শব্দটি কোরআনে বহু স্থানে উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা সামান্য আরবী জানেন তারা শারাব মানে পবিত্র পানীয় একথা অবগত আছেন। তাছাড়া তিনি কতটুকু মুসলমান তাও সন্দেহের অবকাশ রাখে কেননা মুসলিমের পানী পান করার পর যে দোওয়া পড়তে হয় তা হল। 'সাকাহুম রব্বুহুম শারাবান তহুরা।' গণি সাহেব এ শারাবাম তহুরার মানেটা জানাবেন কি?

এছাড়া লেখক ৬৮ ও ৬৯ আয়াতের ব্যাখ্যা করে মৌমাছিকে নবী বানিয়েছেন। লেখক যে আদৌ কোরআন পড়েন না তার আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল। অহী যার কাছে আসে তিনি যদি নবী হন তাহলে পৃথিবীর সব জড়, চেতন, অবচেতন প্রাণী ও বস্তু সবই নবী। অহীর অর্থ যারা জানে তারাই একথা জানেন। এ সম্পর্কে কোরআনের অসংখ্য আয়াত দিয়ে অহেতুক কলেবর বৃদ্ধি না করে সংক্ষেপে অহীর মর্মার্থ দিচ্ছি।

অহী অর্থ আল্লার নির্দেশ। এলকা অর্থ মনের ভাব সৃষ্টি, এলহাম অর্থ নীরব ইঙ্গিত শিক্ষা ও দীক্ষা দান। এই তিনটিকে কোরআনে আল্লাহর অহী বলা হয়েছে।

সৃষ্টির সেরা মানব জাতির জন্য স্বজ্ঞান ও মুকররব ফিরিস্তা মাধ্যমে প্রভুর নির্বাচিত মানুষের উপর যে পথ নির্দেশ ও জীবন বিধান ব্যবস্থা পাঠান হয়েছে। অর্থাৎ অহী নাজেল করা হয়েছে সেই বিশেষ মানুষ গনইনবী।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যত চেতন প্রাণী আছে, ইহারা বে শিক্ষক ও শিক্ষা কেন্দ্র ব্যতীত মনের স্বাভাবিক গতিতে জীবন যাপন করে সেই মনের স্বাভাবিক ভাব প্রবণতাকে কোরআনে অহী বলা হয়েছে।

কোরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ বলেছেন আমি আকাশ, হাওয়া পানী ও জমিনের উপর অহী নির্দেশ করি।

সর্বোপরি লেখক ৬৯ নং আয়াতের মনগড়া মানে করেছেন। এই আয়াতের মানে হবে: 'এই মধু মক্ষিকা সংগৃহীত রস থেকে বিভিন্ন রঙের মধুর রস বের হয়, যার মধ্যে মানবের জন্য রোগের নিরাময় বা কল্যাণ নিহিত, নিঃসন্দেহেই ইহার মধ্যে ও চিন্তাশীল মানুষের জন্য নিদর্শন রয়েছে।'

লেখক এই আয়াতের মানে প্রসঙ্গে শরাব (মদ) বলেছেন।

পূর্বাপর প্রসঙ্গ অনুযায়ী এই আয়াতে মধুর রস বা সুমিষ্ট পানীয় দ্রব্য শব্দটির ...বী হচ্ছে শারাব।

মোট কথা তার গোটা প্রবন্ধটাই প্রতিবাদযোগ্য। যার প্রতিটি বাক্য শুধু মিথ্যায় আর অজ্ঞতায় ভরা। তাই উদাহরণের সংখ্যা না বাড়িয়ে বলি—এই সব আধুনিক অজ্ঞ লেখকদের হস্তী মূর্খতার কারণ কি?

শেখ সিরাজুল হক, উস্থি,
২৪-পরগণা

কাজীর গান প্রসঙ্গে

পরিবর্তন—শারদীয় ১৩৮৭ সংখ্যার সুধীর চক্রবর্তী লিখিত 'বিশ শতকের গোড়ার দিকে রবীন্দ্র সঙ্গীত নয়, কাজীর গানই ছিল জনপ্রিয়' লেখাটি প্রসঙ্গে কিছু নিবেদন রাখছি।

নজরুলগীতির যশস্বী শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করে উনি কিছু তথ্য ও অভিমত পরিবেশন করেছেন যার মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের ভুল তথ্য, বিকৃতি ও অহেতুক বিরূপতা।

প্রবন্ধের এক জায়গায় রয়েছে 'মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আগে নজরুলগীতির রেকরড ছিল হাতে গোণা।' এটা কি সজ্ঞানে লেখা? নজরুলের সক্রিয় সঙ্গীত জীবন আনুমানিক বিশ বছরের (১৯২২-৪২)। এই সময়ের মধ্যে প্রায় ২০০০ নজরুলগীতি রেকরড হয়েছে। যাদের নাম উল্লেখিত হয়েছে তারা ছাড়াও শিল্পী-তালিকায় আছেন কে মল্লিক, উমাপদ ভট্টাচার্য, শচীন দেববর্মণ, গোপাল সেন, ধীরেন দাস, হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর), আব্বাসউদ্দীন, ধ্রুপদীয়া ললিত মুখোপাধ্যায়, কমল দাশগুপ্ত, কানন দেবী, শৈল দেবী, ইলা ঘোষ, যূথিকা রায়, সুপ্রভা সরকার, চিত্ত রায়, জগন্ময় মিত্র, সত্যেন ঘোষাল, সত্য চৌধুরী, কমলা ঝরিয়া, মানিক মালা, হরিমতী, শান্তা আপ্তে প্রমুখেরা। এ সম্পর্কে যারা উৎসাহী তারা হাওড়ার কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হবেন।

বিমান মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মানববাবুর দুর্ব্যবহারের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতার প্রসঙ্গ ভালো লাগল। বিমানবাবু আমার অনুজপ্রতিম বন্ধু ও দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী। তাঁর একমাত্র স্বরলিপি পুস্তক 'মুকুন্দ দাসের গান'-এর আমি প্রকাশক। তাঁর মত অমায়িক স্বভাবের 'বৈষ্ণব প্রকৃতির' লোক বর্তমানে সত্যিই বিরল। তাই খারাপ লাগলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে বিমানবাবু ও তাঁর পরলোকগত পিতৃদেব শ্রদ্ধাস্পদ সুবল মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে, মনে হয় ইচ্ছাপূর্বক, মিথ্যাচারণ করা হয়েছে। বিমানবাবুর কাছে যা বহুবার শুনেছি এবং তাঁর অন্যান্য আত্মীয়বর্গের কাছে জেনেছি তা থেকে জানাচ্ছি সুবলবাবু আগ্রহী ছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত ও প্রাচীন বাংলা গানে। অন্যান্য গানের সঙ্গে নজরুলগীতিও শুনতেন। কিন্তু নজরুল কখনই তাদের বাড়ি আসেননি; হয়ত এর অন্য কারণও আছে।

রেকরডিংয়ের সুবর্ণ যুগ ত্রিশের দশকে নজরুল ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় সঙ্গীতস্রষ্টা। বিমানবাবুর কাছেই জেনেছি যে যদিও তিনি ৺সুবল দাশগুপ্ত, ৺গিরীন চক্রবর্তী, ৺চিত্ত রায় এবং দুর্গা সেনের কাছে শিখেছেন তবুও তাঁর নজরুলগীতি সংগ্রহের মূল উৎস হল সে যুগের রেকরড সম্ভার। কাজেই পিতা সুবল মুখারজির কাছেই বিমানবাবু মূলত নজরুলগীতি চর্চা করেছেন তথ্য হিসাবে এটা কাল্পনিক। বিমান বাবু এ তথ্য মানববাবুকে দিয়েছেন, আমার কাছে তা অচিন্তনীয়!

দ্বিতীয়ত, সুবল দাশগুপ্ত পরলোকগমন করেন ১৯৫৩ সালে এবং নজরুলের রচনায় তিনি সুর দিয়েছেন এমন গানের সংখ্যা অনধিক কুড়ি। প্রধানত ৺প্রণব রায় রচিত গানেই তিনি সুরারোপ করতেন। তাঁর মৃত্যুর সময় বিমান মুখারজির বয়স ১৮র বেশি নয়। কাজেই সুবল দাশগুপ্তের কাছে বিমানবাবু অনেক নজরুলগীতি শিখেছেন—এ ধারণা নানা কারণেই গড়ে উঠতে পারছে না।

তাহলে আলোচ্য নিবন্ধের এ 'মিথ্যাচার' কেন? সম্ভবত এর উত্তর পাওয়া যাবে অন্য কোথা, অন্য কোনখানে! মানবেন্দ্রবাবুর গাওয়া নজরুল গীতির রেকরড-সমূহের একেবারে প্রথমদিকের ট্রেনারবৃন্দ হলেন: কমল দাশগুপ্ত, অনিল বাগচী, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রমুখেরা। অনুমান করি এদের পরিচালনাধীনে গাওয়ার সময় মানববাবু শিল্পীর স্বাধীনতার অজুহাতে যথেচ্ছাচারের স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারেননি, কারণ তারা প্রত্যেকেই প্রবীণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ। 'বাজার' তৈরি হওয়ার পরই ওর প্রয়োজন হল 'প্রতিষ্ঠিত' নয় এমন একজন ট্রেনারের, তিনি যদি বয়সে ওর চেয়ে নবীন হন তাহলে তো কথাই নেই! সব প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে দিলেন বন্ধুবর বিমান মুখারজি, দুঃসহ অপমান, অবিচার ও অবহেলা সহ্য করে—কিন্তু কেন? এর একটা সম্ভাব্য উত্তর আছে কিন্তু তা এতই অপ্রিয় যে তার উল্লেখ থেকে বিরত থাকছি।

'আঁখি তোলো, আঁখি তোলো না! (তেমন Soft Composition নজরুল গীতি-সাম্রাজ্যেও দুর্লভ!) 'তোমারেই আমি চাহিয়াছি প্রিয়', 'তোর নামেরি কবচ দোলে' প্রভৃতি গান যে সুরে মানবেন্দ্রবাবু রেকরডে গেয়েছেন তা কোথায় পেলেন? উদাহরণ আরো বহু আছে। নজরুলের সক্রিয় সুস্থ জীবনে এসব গান রেকরডে গাওয়া

হয়েছিল। প্রয়োজনে সে সকল রেকরড দাখিল করতে প্রস্তুত আছি। আমি বলি, ট্রেনার হিসাবে বিমানবাবুকে সামনে 'শিখণ্ডী' রেখে মানববাবু এসব 'সংস্কৃতি-বিরোধী' কাজ করছেন। কিন্তু কেন? কোন অধিকারে?

জানলাম মানববাবু এককালে আধুনিক গানের সুর নিয়ে অনেক experimentation করেছেন। ঘটনা-পঞ্জী যা যা বলে তা থেকে বলা যায় —নজরুলগীতি অবলম্বন করার আগে উনি জনগণের কাছে বিস্মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। তাই কি সেই experimentation-এর জের চলছে নজরুলগীতি নিয়ে? এই প্রসঙ্গে বোধহয় ওকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে নজরুলের সব গান গজল-ধর্মী নয় বা howling নয়। এমন কি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি বিভিন্ন ধারায় কাজী সাহেব তাঁর গানে সুর-যোজনা করেছেন, একথা স্মরণ রাখা প্রতিটি নজরুলগীতি-অনুরাগীর কর্তব্য। ওর গাওয়া শচীন দেবের কালজয়ী গান 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া' বা 'আঁখি তোলো, আঁখি তোলো না' শুনলেই আমার কথার সত্যতা নজরুল-অনুরাগীরা বুঝতে পারবেন।

মানববাবু, কিছু ধরনের গানে আপনার যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু সব ধরনের গানে নয় এবং তা কারো ক্ষেত্রেই নয়। পঙ্কজ মল্লিক, শচীনদেব বর্মণ, হেমন্ত মুখারজির ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। তাই আপনার যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন একজন অনুরাগী শ্রোতা হিসাবে অনুরোধ করি যে কোন নজরুল গীতিকে আপনার মত করে নেওয়ার জন্য তার সুর যথেচ্ছভাবে বদলাবেন না ও 'গায়কী' পরিবর্তন করবেন না। অন্য অনেক শিল্পীর চেয়ে অন্তত পারিবারিক কারণে নজরুল সম্পর্কে আপনার মমত্ব-বোধ ও শ্রদ্ধা বেশি থাকা উচিত। আপনার কাকা শ্রদ্ধাস্পদ রত্নেশ্বর মুখারজির বিশেষ গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন নজরুল আর সিদ্ধেশ্বরবাবু একসময় তাঁর শিষ্য ও সহচর ছিলেন। আপনার যোগ্যতা সত্ত্বেও গত ৬/৭ বছরের মধ্যে আপনার রেকরড-করা নতুন কোন গান কি জনসমাদর পেয়েছে?

পরিশেষে বাংলা গানের ধারায় চিরভাস্বর শিল্পী ৺শচীন দেববর্মণ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি নিয়ে একটি বিনীত নিবেদন। সঙ্গত কারণেই অনুমান করি যে শচীনবাবু তাঁর কথায় হেমন্ত-বাবুর মত soft melodious rendering বোঝাতে চেয়েছিলেন। কারণ মানববাবুর যা quality তার গগন-সীমায় তখন ছিলেন মহম্মদ রফি, তালাত মামুদ, মুকেশ প্রভৃতিরা। কাজেই হেমন্তবাবুর অনুরূপ বা নোভেল কোন রেনডারিং ছাড়া বোম্বাইতে মানববাবু কোন আশা ছিল না। সি রামচন্দ্র সুরারোপিত 'আনারকলি' বা শচীন দেববর্মণের 'জাল' ছবিতে হেমন্ত মুখারজির গাওয়া গান স্মরণ করলে, মনে হয় মানববাবু উপকৃত হবেন।

শচীনদেবের কথার মর্মোদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে মানবেন্দ্র রেকরডে গাইলেন 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া'! এবার সুধীরবাবুকে জিজ্ঞাসা করি ঐ গান গেয়ে মানবেন্দ্রের 'শিল্পীসুলভ অতৃপ্তি' তৃপ্ত হয়েছে তো?

সর্বাঙ্গীণতায় নজরুল ছিলেন অনন্য স্রষ্টা—শিল্পী। তাঁর আরও ছিল অন্য শিল্পীর শিল্পরীতির প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ব। তাই একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল একই সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ইন্দুবালা, আঙুরবালা, শচীন দেববর্মণ, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শৈল দেবী, কানন দেবী, ইলা ঘোষের মত ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শিল্পীদের উপযুক্ত গান সরবরাহ করা। এখানে নিঃসন্দেহে তিনি সর্বোত্তম। বিমানবাবুকে অনুরোধ করি ১৯৭২ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আপনাকে সামনে রেখে যা করা হলো তা একটু পিছন ফিরে ভেবে দেখতে।

কামনা করি সংশ্লিষ্ট সকলের শুভ-বুদ্ধি জাগ্রত হোক।

তপন সেন, কলকাতা-৫

॥ ২ ॥

কলকাতায় নজরুল গীতির একক আসর প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ধীরেন বসুকে নিয়ে (১৯৭০)। শ্রীবসুই প্রথম আমন্ত্রিত নজরুলগীতি শিল্পী যিনি বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় নজরুলগীতি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করে আসেন।

বর্তমানে শ্রী বসুই নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ, জনপ্রিয় ও সর্বজনস্বীকৃত নজরুলগীতি শিল্পী এবং নজরুল-গীতির জনপ্রিয়তার মূলে শ্রী বসুর অবদান সবচেয়ে বেশি একথা না বললে সত্যের অপলাপ করা হয়।

বিশ্বনাথ দত্ত, কলকাতা-৩৮

॥ ৩ ॥

সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় রবীন্দ্রসঙ্গীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদী, রজনীকান্ত, নজরুলগীতি এবং আধুনিক গানের অনেক শিল্পীর নামোল্লেখ করেছেন; কিন্তু বিশিষ্ট নজরুলগীতি শিল্পী ফিরোজা বেগমের নাম কোথাও উল্লেখ করেননি। লেখক কি তাঁর নাম শোনেননি?

অমিয় মৈত্র, কলকাতা ৭৮

লেখকের আত্মপক্ষ

তপন সেনের চিঠিটি পড়ে নজরুল-গীতি সম্পর্কে তাঁর আবেগ ও উৎসাহ বিষয়ে জানতে পেরে ভাল লাগলো। তবে এ চিঠির বারো আনা মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে জ্ঞানদান এবং বিমান মুখোপাধ্যায়কে প্রীতিমধুর উপদেশ। বিমানবাবুকে 'শিখণ্ডী' রেখে মানববাবু যেসব 'সংস্কৃতি-বিরোধী' কাজ করছেন সে সম্পর্কে তপনবাবু যতখানি ওয়াকিবহাল ও সতর্ক, আমরা সে সম্পর্কে ততখানিই অজ্ঞান ও অক্ষম। আশা করব, এ বিষয়ে মানবেন্দ্রবাবু ও বিমান-বাবু পরিবর্তনের পাতায় তাঁদের বক্তব্য ও তথ্য জানাবেন। অবশ্য তাতে পত্র-লেখকের মানবেন্দ্র-বিদ্বেষ কতখানি শান্ত হবে জানি না। চিঠির শেষে তপনবাবু 'সংশ্লিষ্ট সকলের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক' বলে যে আশা প্রকাশ করেছেন সে তো সকলের কাম্য। তবে এই 'সংশ্লিষ্ট সকলের' মধ্যে আমি নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারছি না। আমি নিতান্তই একজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লেখক ও বাংলা গানের শুভার্থী। যা লিখেছি তা বিমানবাবু ও মানবেন্দ্র-বাবুর সঙ্গে ইনটারভিউ নিয়ে লিখেছি। তাঁরা যদি কোন ভুল তথ্য ও বক্তব্য বলে থাকেন তবে সম্ভবত সে দায়িত্ব তাঁদের। আমার লেখাটি প্রকাশিত হবার পর বিমান মুখোপাধ্যায় দুটি চিঠি লিখেছেন আমাকে। তার প্রথমটিতে জানিয়েছেন: 'লেখা এত ভাল হয়েছে যে আমি ও মানবেন্দ্র অভিভূত'। দ্বিতীয় চিঠিতে লিখেছেন: 'আপনার সততা এবং নির্ভীকতা আমাদের এবং আমাদের আত্মীয় বন্ধুদের মুগ্ধ করেছে।' বিমান-বাবুর পত্রাংশের এই উৎকলন আমার আত্মপ্রচারের জন্য নয়। আমি বলতে চাই আমার লেখায় বিমানবাবুর দেওয়া কোন তথ্য বিকৃত থাকলে বা ভুল থাকলে বা 'ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যাচারণ' থাকলে তা নিশ্চয়ই তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তপন সেন লিখিত 'নানা ধরনের ভুল তথ্য ও বিকৃতি'-র দায় আমার নয় এবং অন্যান্য নজরুল গীতি শিল্পীর প্রতি 'অহেতুক বিরূপতা'-র তো কোন প্রশ্নই নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পরিবর্তনে আলোচ্য নিবন্ধটি লেখার ঠিক আগে মানবেন্দ্র ও বিমানবাবুর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে আমার। তার আগে বিমান-বাবুর কথা জানতাম না, তবে মানবেন্দ্র-বাবুর গান অন্যান্য অনেক বাঙালীর মত শুনেছি এবং তাঁকে মঞ্চে গাইতে দেখেছি বেশ কবার। অবশ্য তপনবাবু লিখিত 'নজরুলগীতি অবলম্বন করার আগে উনি জনগণের কাছে বিস্মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন' মন্তব্যটি আমি মানি না। আমি মনে করি আধুনিক বাংলা গানে মানবেন্দ্র একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব। ভদ্রলোকের গানের ভিতটুকুও পাকা।

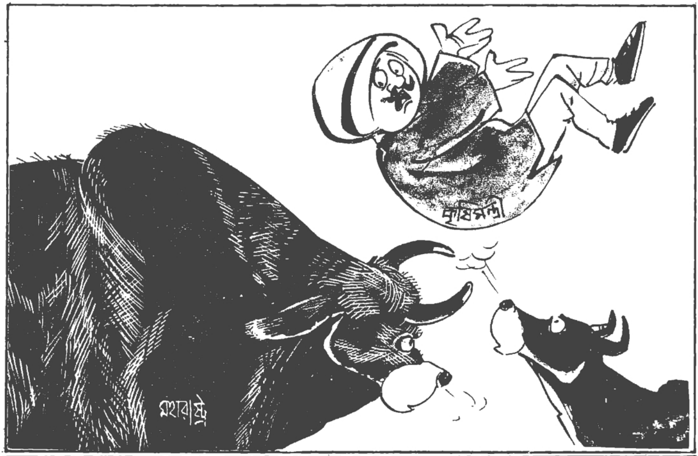
আমি লিখেছিলাম 'মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আগে নজরুলগীতির রেকডড ছিল হাতে গোনা।' তপনবাবু প্রশ্ন করেছেন—'এটা কি সজ্ঞানে লেখা?' এবং দাখিল করেছেন প্রাক্তন নজরুলগীতির রেকরডের বাইশজন শিল্পীর তালিকা। উৎসাহীদের কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন। ধন্যবাদ। কল্যাণবাবুকে চিনি, জানি ও শ্রদ্ধা করি। বাইশজন কেন আরও শিল্পীর তালিকা দেওয়া যায়। তবে প্রশ্ন হল এসব রেকরড কি বাজারে পাওয়া যায়? আসলে আমি সদ্যতন যুগের কথাই বলতে চেয়েছি। অতীতের বিখ্যাত গায়কদের অনুল্লেখ অজ্ঞানতা বা অশ্রদ্ধাবশত নয়।

পরিশেষে তপন সেনের চিঠি পড়ে একটি বিখ্যাত মন্তব্য মনে পড়ল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নানা ঐতিহাসিক ভুলভ্রান্তি দেখিয়ে চিঠি লিখেছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। বঙ্কিম তাঁকে লিখে-ছিলেন, 'এতই যখন জানেন তবে লেখেন না কেন?' এর ফলে রমেশ-চন্দ্র বিখ্যাত উপন্যাসগুলি লেখেন। তপনবাবু, আপনি কবে সঙ্গীত বিষয়ে লিখবেন? চিত্ত পিপাসিত রে।

বিশ্বনাথ দত্ত, অমিয় মৈত্র তাঁদের চিঠিতে দুজন জনপ্রিয় নজরুলগীতি গায়কের নাম আমার লেখায় না থাকায় অনুযোগ করেছেন। অভিযোগ মাথা পেতে নেওয়া গেল। অবশ্য অনুল্লেখ অজ্ঞতা বা অশ্রদ্ধাবশত নয়। শিল্পী দুজনের উল্লেখ ঐতিহাসিক দিক থেকে অবশ্যই বাঞ্ছনীয় ছিল। তবে সাঙ্গীতিক মূল্যায়নের ব্যাপারে আমার তো ভিন্নমত থাকার স্বাধীনতা আছে, নয় কি? আর সবচেয়ে বড় কথা, আমার লেখাটি কিন্তু নজরুল গীতি গায়নের ইতিহাস নয়, শিল্পীদের নামাবলীও নয়। তবু পত্র লেখকদের ধন্যবাদ জানাই।

সুধীর চক্রবর্তী, কৃষ্ণনগর

এবার কুড়ি টাকার সাম্মানিক পাবেন ফারুক এ জামিল।



অম্লমধুর

চিংড়ির নাম ইঁচা।
কুটলে হয় মিছা॥
রাঁইধ্‌লে হয় বড়ি।
খাইলে যায় পড়ি॥



ইঁচা কোটি কোটি।
বাড়ে গুটি গুটি॥
ভক্তিবাবু দিবো।
ধনবানে খাইবো॥

ইঁচা খাইতে চান?
বিদেশ চইলা যান।
ডলার দরে ইঁচা কিইন্যা
'ভক্তি'-রসে খান॥

★

বুলেট ঘায়ে নেতা মরেন
খবর সর্বনাশা,
এডিটর সব গোঁফে হাসেন
পাতা ভরবে খাসা।

★

বড়া সাব স্টেনোকে নিত্যি দেন লিফট,
আবডালে স্টেনো নেন কেরানীর গিফট।
শ্যামও রাখেন, কূলও রাখেন,
সপ্তদশী ড্রিফট;
ময়দানে হাওয়া খান
দিনে দুই শিফট।

★

বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা,
পুলিশে ছুঁলে বিশ ঃ
বউয়ে ছুঁলে বিনা ঘায়েই·
জ্বলুনি অহর্নিশ।

বসুন্ধর





নিউ মারকেট—যা হবে

ইংরেজরা এদেশে এসেছিল ব্যবসার সূত্র ধরে। সেই সূত্রেই শহর কলকাতার জন্ম। জন্ম থেকেই কলকাতায় অনেক বাজার। রূপচাঁদ পক্ষী কলকাতার বাজার নিয়ে ছড়া বেঁধেছিলেন: 'বাগবাজার কুলি বাজার/বাজারে বাজারে একাকার/এত বাজার দোকানদার/কোন রাজ্যে নাইকো আর।'

বাজার মানেই ব্যবসার প্রসার। ব্যবসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা শহরও বাড়তে লাগল আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল বাজারের এলাকা ও সংখ্যা। কলকাতার ক্ষুদে জমিদারেরা গড়ে তুললেন স্ব-স্ব নামাঙ্কিত বাজার। এক ঢিলে অর্থ ও যশ দুই-ই।

সাহেবরা চাইছিলেন অন্যরকম। নেটিভ-গন্ধী বাজারগুলো তাদের মোটেই পছন্দ ছিল না। তারা চাইছিলেন সম্পূর্ণ বিলেতী কেতায় স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বাজার তৈরি করতে যেখানে বিশেষ করে ইউরোপীয়দের দরকারে লাগে এমনি প্রত্যেকটি জিনিস পাওয়া যাবে। ১৮৬৬ সালে এরকম একটি পূর্ণাঙ্গ বাজার নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে একটি কমিটি তৈরি হল। দেশী বাজারগুলোর পরিবেশ ছিল অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা। কলকাতার করদাতারা একটা ভাল বাজারের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করলেন, ১৮৬৩ সালে। ইতিমধ্যে শহরের সীমারেখা বাড়ছিল, তেমনি বাড়ছিল এর অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি হিমসিম খাচ্ছিলেন কলকাতাকে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে। ১৮৩৬ সালেই লর্ড অকল্যানড নিয়োগ করেছিলেন ফিভার হসপিট্যাল কমিটি। তারাও দীর্ঘ রিপোর্টে কলকাতা বাজারের পরিচ্ছন্নতা ও অনুপযুক্ততার ব্যাপারে বহু বক্তব্য পেশ করেছিল। এই সমুদয় ঘটনার নীট ফল ১৮৬৬ সালের কমিটি।

এরা নতুন বাজারের জন্যে নির্বাচন করলেন হাড়িয়াবাগানের পূর্বদিকে ফেনউইক বাজারকে। এই নামে একটা রাস্তা এখনও আছে। এর চতুর্দিকে ছিল নোংরা গলি ও ঘিঞ্জি বস্তী। ১৮৭১ সালে গড়া হল কলকাতা বাজার আইন। এর আট নমবর ধারায় কলকাতার 'জাসটিস অব পীস'-রা জমি কিনে নতুন বাজার তৈরির ক্ষমতা পেলেন। ঐ বছরই পুরনো বাজার ভেঙে নতুন বাজার তৈরির কাজ শুরু হল। বাড়ি তৈরির অর্ডার পেলেন সুবিখ্যাত বার্ন কোমপানি। একটা চতুর্ভুজ বর্গক্ষেত্রের তিনটে দিক নিয়ে বাড়ি তৈরি হল। একটা দিকে পুরো তিনশো ফুট ফাঁকা। ওদিকে লিণ্ডসে স্ট্রীট। ঢুকবার সদর দরজা। লাল ইঁটের তৈরি বাড়ি। সঙ্গে বিরাট উঁচু ঘড়ি বসানো মিনার। শুধু বাজারের প্রয়োজনেই নয়, দ্রষ্টব্য হিসেবেও এক অপূর্ব স্থাপত্যকীর্তি। শোনা যায়, এর স্থপতি নাকি এর জন্যে পুরস্কৃতও হয়েছিলেন। জমিসুদ্ধ এই মূল অর্থাৎ দক্ষিণ অংশের তৈরিতে খরচা পড়েছিল সে যুগে ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। টাকাটা ধার দিয়েছিলেন সরকার স্বয়ং।

কিন্তু ১৮৭১ সালের আইনে জাসটিসদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকায় নতুন বাজার তৈরি করেও সেটা জনসাধারণের ব্যবহারের কোন ব্যবস্থা করা যায়নি। ১৮৭৪ সালের নতুন আইনে সেই মত ব্যবস্থা করলে ঐ বছরের গোড়াতেই বাজার সাধারণ মানুষের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। তখন এর নাম ছিল নিউ মারকেট। পরে এর প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে নাম হয় স্যার স্টুয়ারট হগ মারকেট। স্যার স্টুয়ারট ছিলেন তখনকার কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। তাঁর কার্যকালের

মারকেটের স্মৃতি

'হগ মারকেট নতুন করে গড়া নিয়ে এত হৈ চৈ কেন? যুব কংগ্রেসীরাও দেখলাম আমাকে চিঠি দিয়েছে। পড়ে তো ওই মারকেটের ঐতিহ্য ঠিক বুঝলাম না। বহু বছর ওখানে যাইনি। প্রশান্ত শূরের সঙ্গে পরশু গেলাম। ছেলেবেলায় ওপাড়ায় থাকতাম বটে। সে সময় মায়ের হাত ধরে বাজারেও যেতাম। আমার কাছে মারকেটের স্মৃতি ওটুকুই। তা ঘুরে দেখলাম সব ভেঙে পড়েছে। কোথায় আরকিটেকচারাল বিউটি'?

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মন্তব্য, সাংবাদিকদের কাছে, মহাকরণে নিজের ঘরে বসে। ২১ নভেমবর শুক্রবার, সন্ধ্যায়।

স্টার 'সওদা' করতে নিউ মারকেটে

বিশ্বজিৎ সিংহ

দুপুরে নিউ মারকেটের ভেতরে ঢুকেই দেখি এক ম্যাকসি এবং দুই ববচুল। পোশাকের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। শো কেসের শাড়ি দেখছেন।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে মহিলা চার দিকেই। কেউ ভ্যানিটি ব্যাগ বুকের কাছে আলতো ছুঁইয়ে হাঁটছেন, কারো হাতে প্যাকেট। একেবারে প্রমীলা রাজ্য। অনেকেই এসেছেন আয়া নিয়ে, কারো সঙ্গে সমবয়সী প্রতিবেশী। একা একাও কেনাকাটা সারছেন কয়েকজন। কারোরই বয়স পঁচিশের কম কিংবা পঞ্চাশের বেশি নয়। প্রায় সবাই বিবাহিতা। সুবেশা, সুখী-সুখী মুখ।

হাতে ক্রিম চকোলেট নিয়ে তিন মহিলা। কলকল করতে করতে ঢুকলেন। কসমেটিকস শপে। চোখে গো গো গগলস পাশের স্লিভলেসকে ঠেলা দিয়ে বললেন: 'জানিস, মিসেস বাসু পরশু ডিনার পারটিতে তিন পেগ খেয়েই···। মিঃ ভাট বড়ো ভদ্র। হোসট নন, তবু ওকে নিজে ধরে গাড়িতে তুলে দিলেন।'

শপে মহিলা পা রাখলেই সেলসম্যানরা রেডি। ব্লাউজের দোকান। ডজন ডজন কাটপিস নাড়াচাড়া। এটা কত সাইজ? ওটার দাম কত? তটস্থ উত্তর। শেষে সব সরিয়ে দিয়ে ভ্রূকুটি করে ক্ষীণতনুর জিজ্ঞাসা: 'হলুদের ওপর কালো প্রিনট নব্বই সেনটিমিটার পিস নেই কেন?'

এক শপ মালিকের কথায়: 'বেলা ৬টা থেকে ঘন্টা তিনেক নিউ মারকেট মহিলাদের দখলে। কেনাকাটা বেশি হয় কসমেটিকস, বাটার, ক্রিম, ব্লাউজ, ফল—এই সব। ওরা বহুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে জিনিষ দেখেন বটে: কিন্তু কোথাও না কোথাও কিছু সওদা না করে ফেরেন না। মজার ব্যাপার; দরদাম করেন বড়লোকের গিন্নীরাই, মধ্যবিত্তরা নন।

প্রায় চল্লিশ ওই ভদ্রমহিলা হলেন প্রতিমা। থাকেন ল্যানসডাউনে। কর্তা অফিসে, তনয় ইস্কুলে। বললেন: 'সন্ধ্যার সময়ও আসি বইকি। সপরিবারে। তবে একসঙ্গে এলে তাড়াহুড়ো হয়। তাই দুপুরে টুক করে চলে আসি। ধীরে-সুস্থে দেখেশুনে কেনা যায়। আর সন্ধ্যার তুলনায় ভীড় কম বলে দোকানীরাও বেশি নজর দেয়'।

সুনীতা রায় সিঁথি রাঙা করার আগে চাকরি করতেন। স্বামীই তার সংসার। 'মানুষটা কাজে বেরিয়ে গেলেই মনটা বড় ছটফট করে। ফ্ল্যাটে একা। কতক্ষণ আর ম্যাগাজিন পড়া যায়? আর আমাদের ওদিকে দুপুরেও যা লোডশেডিং। তাই কারেন্ট গেলেই নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে চলে আসি মারকেটে। কোনোদিন কিনি। অনেক সময় কিনিও না। কিন্তু সেলসম্যানরা বিরক্তি দেখান না। তাই স্বচ্ছন্দে সর্বত্র ঘুরিফিরি। এখানে সময়টা কাটে। হাল্কা সুরে গানের রেকরড বাজে। বেশ লাগে'।

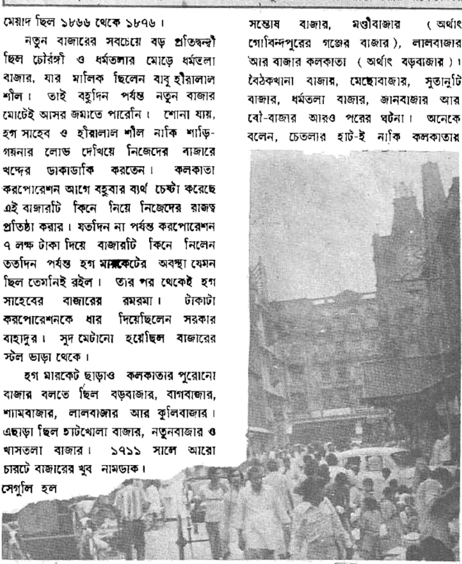
স্ট্যাটাস সিমবলের মারকেটে উজাড় করা সামগ্রী কত ভ্যারাইটি। মহিলারা ঘুরছেন, পছন্দমাফিক কিনছেন। কিন্তু ওই তিন কিশোরী যেন ভিন কন্যা। সেই কখন থেকে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে। নিজেদের মধ্যে এত কী কথা। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগের সঙ্গে মলাট বাঁধানো খাতা। কী চায় ওরা?

কাছে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম: আপনারা দেখছি এক ঘণ্টার উপর এখানে দাঁড়িয়ে। সরল মুখগুলি থতমত। পরিচয় দিতেই এক তন্বী তড়বড় করে বলে উঠলেন: সেই দমদম থেকে এসেছি। বাড়িতেও জানে না। এসেছি কলেজের ক্লাস পালিয়ে। শুনেছিলাম, এসময় ফিলম স্টাররা শপিং করতে আসেন। কই?

মেয়াদ ছিল ১৮৬৬ থেকে ১৮৭৬।

নতুন বাজারের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল চৌরঙ্গী ও ধর্মতলার মোড়ে ধর্মতলা বাজার, যার মালিক ছিলেন বাবু হীরালাল শীল। তাই বহুদিন পর্যন্ত নতুন বাজার মোটেই আসর জমাতে পারেনি। শোনা যায়, হগ সাহেব ও হীরালাল শীল নাকি শাড়ি-গয়নার লোভ দেখিয়ে নিজেদের বাজারে খদ্দের ডাকাডাকি করতেন। কলকাতা করপোরেশন আগে বহুবার ব্যর্থ চেস্টা করেছে এই বাজারটি কিনে নিয়ে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার। যতদিন না পর্যন্ত করপোরেশন ৭ লক্ষ টাকা দিয়ে বাজারটি কিনে নিলেন ততদিন পর্যন্ত হগ মারকেটের অবস্থা যেমন ছিল তেমনিই রইল। তার পর থেকেই হগ সাহেবের বাজারের রমরমা। টাকাটা করপোরেশনকে ধার দিয়েছিলেন সরকার বাহাদুর। সুদ মেটানো হয়েছিল বাজারের স্টল ভাড়া থেকে।

হগ মারকেট ছাড়াও কলকাতার পুরোনো বাজার বলতে ছিল বড়বাজার, বাগবাজার, শ্যামবাজার, লালবাজার আর কুলিবাজার। এছাড়া ছিল চাটখোলা বাজার, নতুনবাজার ও খাসতলা বাজার। ১৭১১ সালে আরো চারটে বাজারের খুব নামডাক। সেগুলি হল সন্তোষ বাজার, মণ্ডীবাজার (অর্থাৎ গোবিন্দপুরের গঞ্জের বাজার), লালবাজার আর বাজার কলকাতা (অর্থাৎ বড়বাজার)। বৈঠকখানা বাজার, মেছোবাজার, সুতানুটি বাজার, ধর্মতলা বাজার, জানবাজার আর বৌ-বাজার আরও পরের ঘটনা। অনেকে বলেন, চেতলার হাট-ই নাকি কলকাতার সবচেয়ে পুরোনো বাজার। ১৭৫২ সালে হলওয়েলের বর্ণনায় কালীঘাট বাজারের খোঁজ পাওয়া যায়।



নিউ মারকেট—যা আছে,

সবার মধ্যে হগ মারকেটই ছিল সেরা। ১৯১২ সাল নাগাদ ফেনউইক বাজার বরাবর ফ্রী স্কুল স্ট্রীট পর্যন্ত আরও ১১ বিঘে জমি নিয়ে বাজারের পূর্বদিকের অংশ আরও বিস্তৃত করা হয়। যার খরচা পড়ে প্রায় ১১ লক্ষ টাকার মত। এবং ঐ শেষ। সংস্কারের কাজ ছাড়া এর পরে নিউ মারকেটের গায়ে তেমন বিশেষ হাত পড়েনি। পুরোনো আমলের লেখকরা এই নতুন বাজারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শুধু প্রাপ্তিযোগের বিচারেই নয়, সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্যেও, যার অনেকটা কৃতিত্বই হল পরবর্তী মারকেট সুপারিনটেনডেনট মিঃ জোনসের। একজন লিখেছেন: বাজারে দোকানঘরের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজারের মত। দুনিয়ায় এমন জিনিস নেই যা নিউ মারকেটে পাওয়া যায় না। আবার একে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বাজার বলেও আখ্যা দিয়েছেন কেউ কেউ। রুডইয়ারড কিপলিং, যিনি কলকাতাকে দুঃস্বপ্নের নগরী (সিটি অফ ড্রেডফুল নাইটস) বলে অভিহিত করেছিলেন তিনিও কলকাতার নিউ মারকেট সম্বন্ধে দু-চার কথা না লিখে পারেননি। আর আমরা, মধ্যবিত্ত বাঙালী? তাদেরও আজ নিউ মারকেট ছাড়া অচল। সওদা না করলেও শো-কেসের দিকে তাকিয়ে চোখের আরাম। সেটা কম কী? ★



কলকাতার মমি রহস্য

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী

এ এক আজব রীতি! মরা মানুষকে অনন্তকাল বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। জীবনে ফিরবে বলে। ওষুধে-মশলায় রঙীন মোড়কে জড়িয়ে শুইয়ে রাখা হল শত শত মৃতের শরীর পিরামিডের নিচে। এরা সব মমি। তামাম দুনিয়ার কাছে মিশর দেশের মমি এক দুর্নিবার আকর্ষণ। গত কয়েক মাসে সেই মমি আবার বিশ্বসংবাদ! মমি নিয়ে মিশরে নতুন চঞ্চলতা. আর কলকাতায় মমি এক্স-রে নিয়েও চলছে অনেক জল্পনা।

মজার ব্যাপার হল: জুলাই থেকে নভেম্বরের মধ্যেই কেন জানি না মমি-রা বিশ্বসংবাদ হয়ে ওঠে।

২৫ নভেম্বর ১৯২২। তরুণ মিশর-সম্রাট তুতেনখামেনের পরম ঐশ্বর্যময় সমাধি গুহার প্রথম পাথরটি সরানো হলো! বিশ্ববাসী চমকে উঠলো। গত ৮ অকটোবরে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত কায়রো মিউজিয়ামের সাতাশটি মমিকে দর্শকের দরবার থেকে নির্বাসনের নিদান হাঁকলেন। তার একদিন বাদে ভারতীয় যাদুঘরে কলকাতার মমি-রহস্য বিশ্লেষণে এগিয়ে এলেন এই শহরের এক বিশিষ্ট রেডিওলজিস্ট ডাক্তার সুভাষ বসু। কলকাতার মমি এক্স-রের ঘটনাটি ভারতে প্রথম! ১০ জুন ১৯৭৫ সালের সকালে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলের অপারেশন থিয়েটারে বহু আমন্ত্রিত দর্শকের সামনে একটি পূর্ণবয়স্ক মমির নারী শরীরের আবরণ উন্মোচন (unwrapping) ডিসেকশন—নখ দাঁত হাড়গোড় সব নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ। সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। ওদিকে ১৮৩৪ সালের জুলাই মাসে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিকে একটি চিঠি লিখে জানালেন বেঙ্গল লাইট ক্যাভালরির লেফটেন্যান্ট ই সি আরচবোলড: কলকাতায় একটি মমি পাঠাচ্ছেন তিনি।

ঘটনাগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক!

কলকাতার যাদুঘরের প্রাসাদপুরীতে 'কাচপাত্রে কৌতুক-আগারে' শায়িত একটি মানব শরীর তিন হাজার আটশো কুড়ি বছর ধরে অপেক্ষা করছে পাতালপুরীর দেবতা অসিরিসের সঙ্গে একাত্ম হবার বাসনায়। পাঁচ বছরের ছোট্ট বাবুই তুতান-মিতান, বুল্লি ও শিবিব তাদের বোঁচা নাক ঘষে মমি-র শো-কেসে। ওদের চোখে ভয় আর মনে কৌতূহল। আর বড়দের মনে অনুসন্ধিৎসা। মমির মানুষটি শুয়ে আছে কাঠের কফিনে। চিত্রবিচিত্র লিনেনে জড়ানো তার শরীর। মুখের কংকালটি বেরিয়ে গিয়ে একেবারে হাড্ডিসার। মুখের আলগা একটা আঁকা আদল রাখা ঠিক বুকের ওপর। পাশে কফিনের ঢাকন। তাতেও আঁকা মানুষটির পূর্ণাবয়ব। মমির চারকোণে ছোট্ট চারটি কাচের থালায় গোলাপী রঙের মিহিদানার মতো রাসায়নিক 'সিলিকা জেল'। শো-কেসের বাতাস থেকে আর্দ্রতা শুষে নেয়। কেসের মধ্যে একটি ডিহাইড্রেশন বুঝবার মিটার। এসবই মমিকে অপটিমাম কনডিশনে রাখবার চেষ্টায়। যাকে ঠিকঠাক রাখতে এতো চেষ্টা সেই মমি কলকাতায় এলো কবে? কেমন করে? কার মমি এটি?

মমি রহস্যের মতো রহস্যময় সেই আগমন কাহিনীও।

৬ আগস্ট ১৮৩৪। বুধবার সন্ধ্যেবেলা এশিয়াটিক সোসাইটির পুরোনো বাড়িতে কাউন্সিলের সভা বসেছে। সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট রেভারেন্ড ডবলিউ এইচ মিল সেদিনের সভাপতি। বোমবে থেকে চিঠি এসেছে আর্চবোলডের। লিখেছেন, মমিটিকে বেশ কষ্ট করেই গুরবের (Gourvah) রাজাদের সমাধি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। জাহাজের নাবিকেরা মোকা (Mocha) থেকে মমি সমেত আর্চবোলডকে নিয়ে আসছিল। তারা শেষ পর্যন্ত বাদ সাধলো। মমি বয়ে আনতে নারাজ। আর্চবোলড সাহেব হালকা রণতরী কুটে (Coote)-র এক অফিসারকে অনুরোধ করলেন বোমবে পর্যন্ত মমিকে কোন মতে পৌঁছে দিতে।

কিন্তু মমি সে যাত্রায় এলো না সে বছরের ১ অকটোবর এশিয়াটিক সোসাইটিতে আর একটি মিটিং বসল। সেদিন আলোচনার জন্য এলো লেফটেন্যান্ট আর্চবোলডের আর একখানা সংযোজনী। যুদ্ধ জাহাজ কুটের সেই অফিসার জানিয়েছেন—না, পারা গেল না! জাহাজের মুসলমান নাবিকদের সংস্কারে আঘাত লাগছে। মৃত শরীরটিকে তারা জাহাজে তুলে কোথাও নিয়ে যেতে পারবেন না। যা অবস্থা তাতে মমিটি মোকা থেকে বাইরে আনার সমস্ত চেষ্টাই কার্যত ব্যর্থ! ওখানেই আবার কবর দিয়ে রাখতে হবে প্রাচীন মিশরবাসীর মৃত শরীরটিকে!

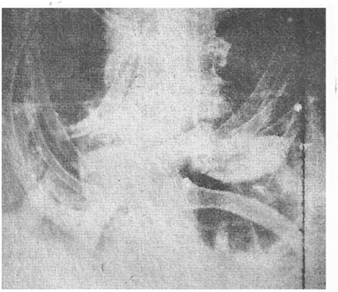
কিন্তু তবুও মমি এসেছিল কলকাতায়। ঠিক কবে যে এলো এখনো পর্যন্ত সেই সন তারিখটির সুলুক সন্ধান পাওয়া না গেলেও একথাটি ঠিক যে ১৮৮২র আগে সেটি কলকাতার যাদুঘরের মাটি ছুঁয়েছে। কেন না ১৮৮৩-তে প্রকাশিত যাদুঘরের দ্রষ্টব্য বিবরণীতে তার উল্লেখ রয়েছে সবিস্তারে

সেদিনের সেই ধর্মবিশ্বাসে আঘাত পড়ার আশংকার প্রতিধ্বনি যেন আজকের আনোয়ার সাদাতের কণ্ঠেও শোনা যাচ্ছে। মিঃ সাদাত সম্প্রতি এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বলেছেন, তাঁর দেশের প্রাচীন আমলের রাজা-রানীদের মৃতদেহ উন্মুক্ত জায়গায় প্রদর্শিত রাখা ইসলাম-বিরোধী কাজ শুধু তাই নয়, এই কাজে খৃস্টান ও ইহুদী ধর্মেরও অনুমোদন নেই। বছরখানেক আগেই মিশরের প্রেসিডেন্ট একবার বলেছিলেন, দেশের পূর্বতন ফারাওদের ও তাঁদের পুরাসম্পদগুলো 'যথাযোগ্য মর্যাদায়' সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু এবারের ঘোষণা দেশ-বিদেশের ইজিপটোলজিস্ট ও মমি-বিশেষজ্ঞদেরকে হতবাক করে দিয়েছে। কায়রো মিউজিয়ামের 'মমি-রুম' দর্শকদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কায়রো মিউজিয়ামের মমি-রুমে গড়ে দৈনিক এক হাজার দর্শক মাথাপিছু অতিরিক্ত ১.৪৩ ডলার দিয়ে মমি দেখতে যেত এই সেদিনও। মিউজিয়ামের সাতাশটি মমির মধ্যে দ্বিতীয় রামেসিসের তিন হাজার দু'শো বছর আগের শরীরটি বিশেষ আকর্ষণীয়। ১৮৮১ সালে মিশর যখন ব্রিটিশের দখলে সেই সময় এই মমিগুলোকে সমাধিক্ষেত্র থেকে কায়রোতে একটি ছোট্ট যাদুঘরে এনে রাখা হয়। ১৯০২ সালে কায়রো মিউজিয়াম খোলা হলে মমিগুলো ওখানে আনা হয়। ১৯২৮ সাল থেকে জনসাধারণকে দেখতে দেওয়া হয় মিশরী মমিগুলো। মমির দেশের মানুষেরা এখন প্রেসিডেন্টের পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায়। তাদের তিনটির মধ্যে একটি পথ বেছে নিতে হবে। মমিগুলোকে পুনরায় 'গণকবর' দিতে হবে, নতুবা তাদের পিরামিডের স্বভূমিতে আবার নির্বাসিত করতে হবে, আর নয় তো লোকচক্ষুর আড়ালে মিউজিয়ামের অন্য কোথাও অন্য কোনখানে শুধু বিজ্ঞানী গবেষকদের জন্য কোন গোপন কুঠরীতে ওদের বাস করতে হবে 'শেষ জীবনটুকু'।

অথচ ওরা তো অনেক আগেই মরে গিয়েছিল। একটি রিপোরট

বলছে, খৃস্টাব্দ সূচনার সময় ৫০ কোটি মমি নাকি মিশরে সমাহিত ছিল। মমিকরণের প্রথম যুগে, হাজার পাঁচ-ছয় বছর আগে, মৃতদেহ মিশরের সাহারা অঞ্চলের তপ্ত বালিতে ফেলে রাখা হত। পচা বা গলার কোন লক্ষণই দেখা যেত না। পরে মিশরীদের মনে হল— রাজারাজড়া, পুরোহিত সম্প্রদায় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মৃতদেহ অমন এলো-মেলোভাবে মরুমাটিতে ফেলে রেখে দেওয়া শোভন নয়। তাই ত্রিভুজ পিরামিড তৈরি করে মৃতদেহ রাখা হতে লাগলো ফারাওদের জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে। দেহের ভেতর থেকে নাড়িভুঁড়ি ও মগজ ইত্যাদি পচনশীল অংশ বের করে নিয়ে শরীরের ছিন্নবিচ্ছিন্ন অংশগুলো সেলাই করে, দেহটি কাপড়ের ব্যানডেজে জড়িয়ে রাখা হত। 'ইজিপ্সিয়ান কটন'-এর স্নিগ্ধ আবেশে বিজড়িত এবং নানান বর্ণে বিচিত্রিত হয়ে মমিরা শুয়ে থাকতো পিরামিডে। ফারাওয়ের মমির সঙ্গে তার প্রিয়জন, পরিচারকবর্গ, এমন কি আদরের বেড়াল কুকুর প্রভৃতির মমিও পিরামিডের সমাধিঘরে দেখা গিয়েছে। অনেকে মনে করেন—মৃত সম্রাটের এইসব প্রিয়জন চাকর-বাকরকে জোর করে হত্যা করে তার মমির সঙ্গে রেখে দেওয়া হত। মৃত্যুর দেবতার উদ্দেশ্যে একই যাত্রায় কোন পৃথক ফল যাতে না হয়! আসলে প্রাচীন মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল— মমীকরণ (mummification) রীতি ও অন্যান্য পারলৌকিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মৃতদেহ মৃত্যুদেবতা অসিরিসের সঙ্গে মিলিত হয়ে



এক্সরে ছবি : মমির বুকের পাঁজরের হাড় ভাঙা

পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে। প্রয়াত মানুষটি পৃথিবীর নতুন প্রত্যূষে সূর্যের মতো পুনরুজ্জীবিত হয়। মিশর দেশের 'বুক অব দি ডেড'-এ মমীকরণ প্রথার শেষ মন্ত্রটি হল, 'তুমি বেঁচে ওঠো আবার, আবার তুমি বেঁচে ওঠো চিরদিনের জন্য। তুমি আবার নবীন হও চিরদিনের জন্য।' অজাতক (Unborn) এসময় দুটো আত্মার অধিকারী হয়, একটি তাঁর অতীত শরীরের (অসিরিস) অন্যটি তার অনন্ত শরীরের (রে)। প্রাচীন মিশরীয়দের জীবনদর্শনে মৃত্যুর প্রতীক অসিরিসের পুনরাবির্ভাব ঘটে 'রে' বা উদীয়মান সূর্যের মধ্যে। সুতরাং মৃত ব্যক্তিকে মমি করে রাখা হয় এই বিশ্বাসে যে একদিন অসিরিস এসে তার হাত ধরে নতুন জীবনের দ্বারে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

কেমন করে মমি করা হতো তার বিশদ বিবরণ কিন্তু কোন মিশরী গ্রন্থে নেই। খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এবং তার চারশো বছর বাদে আর একজন ঐতিহাসিক ডিওডোরাস সিকিউলাস্ এ বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। যীশুখৃস্টের জন্মের ৩১০০ বছর আগে থেকে ৬৩১ খৃস্টাব্দ সময় পর্যন্ত মোটামুটি এই সাঁইত্রিশশো বছর ধরে মমি করার রেওয়াজ ছিল মিশর দেশে। তবে মিশরের বাইরে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর অধিবাসীদের এবং ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের গুয়াঞ্চেদের মধ্যেও মমি করার প্রথা ছিল।

'মমি' শব্দটির আসল অর্থটি কী? মনে হয় 'মমি' কথাটা এসেছে ফারসী 'মামিআ' (mummia) থেকে যার অর্থ আলকাতরা জাতীয় বিটুমিন। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে মমির দেহাবরণে এক ধরনের কালো রঙের ব্যবহার হতে দেখে অনেকে ভুল করেই ভাবতে শুরু করলেন যে মমিগুলো বিটুমিনে চুবিয়ে নেওয়া হয়েছে। পারস্যের লোকেরা এই বিটুমিনকে সর্বরোগহর ওষুধ বলে বেশ গুরুত্বও দিতো। ফলে এক সময় মমির দেহের টুকরো-টাকরা ভেঙে চুরে নিয়ে ওষুধ-পথ্যিতেও লাগানো হয়েছে। কালক্রমে আলকাতরা বিটুমিনের পারসি নামটিতেই মিশরের মরা মানুষগুলো মমি নামে বিখ্যাত হয়ে গেল।

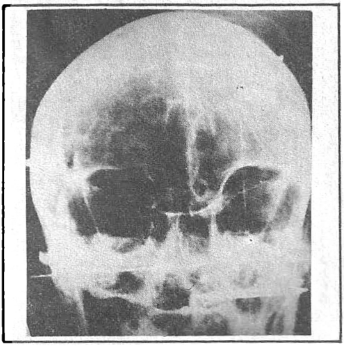
কবিতার যেমন কৃমি-মাংস খুঁটে সমালোচকেরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন তেমন পৃথিবীর নানান মমিকে নিয়ে এই শতকের গোড়ায় এবং গত শতাব্দীর শেষ দিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মাতামাতি শুরু করেছেন। উদ্দেশ্য মমির মানুষগুলো কী রোগে আক্রান্ত হয়ে বা কেমন করে মারা গিয়েছেন, ওদের খাদ্য কী ছিলো, এ সব জানা। মমি-গবেষণায় মোটামুটি প্রমাণিত হয়েছে, যে প্রাচীন মিশরবাসীদের মধ্যে ফুসফুস ও কণ্ঠনালীতে যক্ষ্মা, পিলেরোগ, মেয়েদের নালী ঘা, আর্থ্রাইটিস, গলব্লাডারে বা কিডনিতে পাথুরিয়া ইত্যাদি অসুখ ব্যাপকভাবে ছিলো। ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি মমির প্যালিও প্যাথলজিতে (শরীরের টিসু ও হাড় নিয়ে গবেষণায়) ধরা পড়েছে মিশরের দ্বাদশ রাজবংশের আমলের দুই ভাই নেখট আংখ ও খনুম নাখট-এদের প্রথম জনের ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডে কোন সময়ে বালি ঢুকে গিয়ে Sand pneumoconiosis, হয়েছিল। এক কুড়ি-বাইশ বছরের যুবতীর মমিকে পরীক্ষা করে তার শরীরে গিনি ওয়ার্ম জাতীয় কৃমি ও সিসটোসো-মাইয়াসিস রোগের লক্ষণ দেখা গিয়েছে। প্রথম রোগটি সাহারার বালু-ঝড়ের পরিণাম ও দ্বিতীয়টি নীলনদের বন্যাবাহিত পলি থেকে উদ্ভূত বলে চিকিৎসকরা মনে করেন। তার অর্থ হল মিশরের জল ও বালি এবং নিজস্ব পরিবেশ সঞ্জাত রোগই তাদের অসুস্থতা ও মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

মৃত্যুর কারণ ও অসুখ বিসুখের খবর জানতেই কলকাতার মমির একস-রে করা হল গত অকটোবর মাসে। যতদূর জানি ভারতে মমিকে একস-রে ক্যামেরার চোখ দিয়ে এই সর্বপ্রথম দেখা। ঘটনাটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা ছাড়া জয়পুর ও লখনউ মিউজিয়ামে মমি আছে। যতদূর শুনেছি—এদের কোন একস-রে স্কায়াগ্রাম এখনো হয়নি। ডাঃ সুভাষ বসু ও তাঁর সঙ্গীরা একটি পোর্টেবল একস-রে মেশিন এনেছিলেন সেদিন যাদুঘরে। মমিকে তার কাঁচপাত্র থেকে একটুও না সরিয়ে একস-রে নেওয়া হল তার। ঠিক সকাল সাড়ে দশটায় ভারতীয় যাদুঘরের ডিরেকটর ডঃ সুনীল রায়ের উপস্থিতিতে মিউজিয়ামের ট্রাসটিদের অনুমতিপত্র নিয়ে ডাঃ বসু শুরু করলেন রেডিওলজি সংক্রান্ত এই অভূত-পূর্ব অনুষ্ঠান। দিন কুড়ি বাদে মমির একস-রে রিপোরট বেরলো। এর বিশদ বিবরণী ও ছবি এই প্রথম আমরা প্রকাশ করছি। ডঃ বসুর অবজারভেশন বলছে :

এই নরকঙ্কালটি এক পূর্ণবয়স্ক সুঠাম পুরুষ মানুষের। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কঙ্কালটিতে নেগ্রোইড বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। মমির মানুষটির বয়স ৫০ থেকে ৬০ এর মধ্যে। নিচের চোয়ালের মাড়ি অংশ কিছুটা বসে গেছে তবে দাঁতগুলো অক্ষত রয়েছে। মাথার খুলি অবিকৃত। কিন্তু বুক পিঠের পাঁজর ও কণ্ঠায় বেশ ক্ষতের চিহ্ন। সম্ভবত কোন ভোঁতা হাতিয়ার দিয়ে আঘাত করা হয়েছিলো। ফরেন-সিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনে হয় ওকে হত্যা করা হয়েছে পিটিয়ে। ধারালো কোন অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়নি। মেরুদণ্ডের হাড়ে স্পণ্ডিলাইটিসের লক্ষণ ধরা পড়েছে। হাঁটুতে ছিল বাত। এই রোগটি তাকে ক্রমশ পঙ্গু করে দিচ্ছিলো।

ডঃ বসু মমির মানুষটির মৃত্যুর দুটো সম্ভাব্য কারণের কথা অনুমান করছেন। প্রথমটি—প্রাচীন মিশরের মমিকরণের সেই রীতিটিকে স্মরণ করায় যে প্রথায় মৃত সম্রাটের পরিচারকদেরকেও জোর করে 'জীয়ন্তে মৃত' করা হত। অর্থাৎ বলপূর্বক হত্যা করা হত। দ্বিতীয়টি হল, মমির ব্যক্তিটি সম্ভবত ছিল একজন দাস। এবং তার পঙ্গুত্বের জন্য মনিবকে তেমন সেবা করতে পারছিল না। সেইজন্য হয়ত এই অচল দাসকে হত্যা করে মমি করা হয়েছিল।

কলকাতার মমি একস-রে ভারতে সর্বপ্রথম ঘটনা হলেও সারা বিশ্বে এ ধরনের ঘটনা প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৬ সালে। থাসটন হল্যাণ্ড সে



একসরে ছবি : মমির খুলি

বছর লিভারপুলে একটি মমি করা পাখির রেডিওগ্রাফ করেন। দুশো একষট্টিটি প্লেট নেওয়া হয়েছিল পাখিটির। এর পরের বছর স্যার ফ্লিণ্ডার পেত্রি প্রথম মানুষের মমির একস-রে করেন। ১৯০৪ সালে একটি ট্যাকাস করে অনেক কষ্টে ফারাও ষষ্ঠ থুথমোসিস-এর মমিকে কায়রোর এক প্রাইভেট একস-রে ইউনিটে নিয়ে যান কয়েকজন চিকিৎসক।

ম্যানচেসটার বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ভাইয়ের মমির কথা আগে বলেছি। এদের মধ্যে নেখট আংখ-এর একস-রে পরীক্ষায় ধরা পড়েছে সে হিজড়ে বা খোজা ছিল। ম্যানচেসটার মমিদের প্রথম আবরণ-উন্মোচন (Unwrapping) বা মমি-ক্লাটান হয়েছিল ১৯০৬ সালে ডাঃ মার্গারেট মারে নামে একজন মহিলা চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে। মমিদের শব-ব্যবচ্ছেদ করা হল। এই সময় যে অনুমান করা হয়, নেখট আংখ হিজড়ে সেটি গত ১৯৭৫ সালে একস-রে পরীক্ষায় প্রমাণিত হল। কিন্তু ঐ সময়ে অন্য ভাই খনুম নেখট-এর যে 'কুশ-পা' (clubfoot) র কথা ভাবা হয়েছিল ৭৫-এর পরীক্ষায় সেটি মিথ্যে প্রমাণিত হল। ১৯৭৫ সালে ম্যাঞ্চেসটারের মমি নং ১৭৭০-কে নিয়ে একটি ব্যাপক বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা হয়। ১৭৭০ নং আসলে [illegible] পুতুলের মতো এক মমির দেশের মেয়ে। এর পুরোভাগে ছিলেন আর এক মহিলা। তাঁর নাম ডঃ রোজালি ডেভিড। ম্যাঞ্চেসটার মিউজিয়ামের মমিদের শবব্যবচ্ছেদ, একস-রে, দন্ত পরীক্ষা, ফিঙ্গার প্রিন্ট, টিসুর প্যাথলজি পরীক্ষা ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপি ইত্যাদি চিকিৎসাশাস্ত্রের নানান দিক নিয়ে খুঁটিনাটি পরীক্ষা হয়েছিলো। মমি নিয়ে এত ব্যাপক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পৃথিবীতে আর সম্ভবত আগে হয়নি।

কিন্তু এইসব তথ্য খুঁজতে গিয়ে দেখি কলকাতা মমি-ব্যবচ্ছেদের ব্যাপারে অনেক আগেই টেক্কা মেরেছে। ১৮৩৫ সালেই মমির একটি মুণ্ড ও কাপড়ের মোড়কে বাঁধা কয়েকটি মমি করা পাখির বাচ্চার শব ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন কলকাতার এক চিকিৎসক ডঃ জর্জ ইভানস। লেফটেন্যান্ট আর্চবোলড এই মমির অংশগুলো সেদিন এশিয়াটিক সোসাইটিকে তুলে দিয়েছিলেন। ডঃ ইভানসের রিপোর্ট থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

'মমি-করা মুণ্ডুটি কুড়ি-বাইশ বছরের কোন যুবতীরই হবে। তার আকৃতি সাধারণ মেয়েদেরই মতো ছিলো। বয়সটা নির্ণয় করেছি ওর দাঁতগুলো পরীক্ষা করে যা দৈনন্দিন ব্যবহারে খুব একটা বেশি ঘষা খায়নি। দুই চোয়ালের ওপর দাঁতকপাটি একটু বেরিয়ে আছে, চুলের রং এবং টায়রার মতো একটু গঠন দেখে একে মহিলার মুখ বলেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।....অন্যান্য কিছু বিশ্লেষণে সিদ্ধান্তে আসা অসমীচীন হবে না যে মেয়েটি সম্ভবত মিশরী ও আবিসিনীয় এই দুই রক্তের মিলনে উদ্ভূত।' ডঃ ইভানস আরও জানিয়েছিলেন, যে পাখিগুলো টিটিভ অথবা ট্রিঙগা জাতীয় বিহঙ্গ।

১৮৯৬ সালে মমির প্রথম একস-রে হয়েছিলো লিভারপুলে—সেই মমি পাখির। ১৮৩৫-এ অর্থাৎ আরও একষট্টি বছর আগে মমি-ডিসেকশন হল কলকাতায় সেখানেও কয়েকটি পাখি। জানি না, কলকাতা এ ব্যাপারে বিশ্বে প্রথম কিনা।

কবি সত্যেন দত্ত 'মমির হস্ত' কবিতায় লিখেছেন :

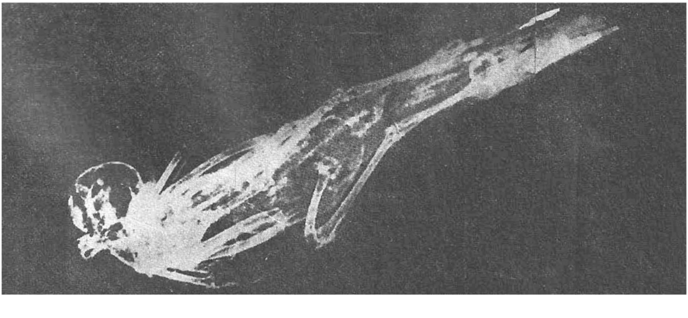
কার দেহে, কোন কালে লগ্ন ছিলে তুমি
নীলিমামণ্ডিত, ক্ষুদ্র কঙ্কালাগ্র কর

শিশুর আগ্রহে স্পর্শিয়াছ তুমি
জননীর বুক কত খেলিয়াছ খেলা,—

রাজদণ্ড হয়ত গো ধরিয়াছ তুমি
আজ তুমি কাচপাত্রে কৌতুক-আগারে।

যাদুঘরের তথ্য বিবরণী বলছে মমির এই হাতটি কায়রোর কোনও রাজার সমাধি বা পিরামিড থেকে সংগৃহীত। এবং প্রায় তিন হাজার বছরের পুরনো। ১৮৪৪ সালে ডবলিউ সি কটন নামে এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-গ্রন্থাগারিক এটি দান করেছিলেন।

কলকাতার মমি-রহস্য উদ্ঘাটনের নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। বিজ্ঞানী বলছেন, সে এক মেহনতী প্রৌঢ়, হয়ত বা ক্রীতদাস, কঠিন আঘাতে মৃত। কবি বলেছেন : সে ছিলো রাজসভার প্রধান কবি। কলকাতা দুটোই মেনে নিক না। ★



মমির প্রথম একসরে ফটো। মমিটি পাখীর

ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি আবার আন্দোলন শুরু করেছে

জাহ্নবীকুমার সরকার

ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি আবার আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। জুন মাসের দাঙ্গায় নিহত হাজার মানুষের তাজা রক্ত এখনও শুকিয়ে যায়নি। এরই মধ্যে আবার আন্দোলনের প্রস্তুতির খবরে ত্রিপুরার জনমনে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

উপজাতি যুব সমিতির অহিংস আন্দোলনের কর্মসূচী হিসাবে লাগাতার অনশন শুরু হয়েছে ২৫ অকটোবর থেকে। অনশন শুরু হওয়ার কথা ছিল ২ অকটোবর থেকে কিন্তু হয়নি। রাজ্য সরকারের সঙ্গে যুব সমিতির নেতাদের আলোচনার পর আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। 'উপজাতি যুব সমিতি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার জন্যই আন্দোলন থেকে বিরত রয়েছে'—মুখ্যমন্ত্রীর এই বিবৃতির প্রতিবাদে যুব সমিতি আবার আন্দোলন শুরু করেছে, চলবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত।

ওদের দাবি : (১) নির্দোষ আটক ব্যক্তিদের অবিলম্বে মুক্তিদান (২) রাজ্য সরকারের ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব বাতিল করে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সামগ্রিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন (৩) দীনেশ সিং কমিটির রিপোরট অবিলম্বে কার্যকর করা (৪) অবিলম্বে জেলা পরিষদ নির্বাচন ও ষষ্ঠ তপশীল চালু করা (৫) দাঙ্গা ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতিদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ।

রাজ্যের ১৬টি জায়গায় অনশন চলছে। প্রায় ১.৫০০ জন উপজাতি অনশনে অংশগ্রহণ করেছে। আন্দোলনের পরিচালনা করছেন উপজাতি মহিলা তথা ত্রিপুরা সুন্দরী বাহিনীর সভানেত্রী পবিত্ররানী জমাতিয়া। শ্রীমতী জমাতিয়া বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়ার স্ত্রী।

ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব বাতিল করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন, এবং দীনেশ সিং কমিটির রিপোরট কার্যকর করা সম্পর্কে রাজ্য সরকারের মনোভাব সুস্পষ্ট। কেন না এরই মধ্যে রাজ্যে ২টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়ে গেছে। ট্রাইব্যুনাল ২টি ১ ডিসেমবর থেকে কাজ শুরু করেছে। আগরতলার বিচারপতি আর বি সিনহা এবং কলকাতার অবসর প্রাপ্ত বিচারক এম মুৎসুদ্দি ট্রাইব্যুনালের সঙ্গে যুক্ত।

দীনেশ সিং কমিটির সুপারিশ রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে মানতে নারাজ। দীনেশ সিং কমিটি তাদের রিপোরটে ৬টি প্রস্তাব রেখেছেন। এই রিপোরট নিয়ে ৬ নভেমবর রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় সিদ্ধান্ত : (১) কেন্দ্রীয় তদারকিতে অর্থকরী ব্যাপারে তদারকি কমিটি গঠনে রাজ্য সরকার সম্মত হতে পারেননি। রাজ্য সরকার নিজের বিবেচনা অনুযায়ী তদারকি কমিটি গঠন করবেন। (২) শান্তি ও ত্রাণের ব্যাপারে নতুন কমিটি গঠনের প্রয়োজন নেই, কেন না বর্তমানে যে কমিটি কাজ করছে তাই যথেষ্ট। (প্রসঙ্গত জুলাই মাসে শান্তি ও ত্রাণ কমিটি গঠন করা হয়েছিল, এই কমিটিতে বামফ্রনটের শরিক সি পি আই এবং কংগ্রেস (ইউ) রয়েছে।) (৩) উপজাতি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও রূপায়ণে নতুন কমিটি গঠনের প্রয়োজন নেই (৪) উপজাতিদের জমি পুনরুদ্ধারের কাজে নতুন উদ্যোগের সার্থকতা প্রসঙ্গে রাজ্য সরকার এই কাজ খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে করে আসছেন। তাছাড়া দীনেশ সিং কমিটির রিপোরটে (৫) পুলিশ প্রশিক্ষণ এবং গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষতাবৃদ্ধি, (৬) প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা ও উন্নয়নের সুপারিশ করা হয়েছে।

উপজাতি যুব সমিতির দাবি এবং সরকারের সিদ্ধান্তে মীমাংসার সূত্র দেখা যাচ্ছে না। আলোচনায় বসারও কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। অথচ মন্ত্রীরা বিভিন্ন জনসভায় যুব সমিতির নেতাদের প্রতি আলোচনার আহ্বান রাখছেন যুব সমিতির নেতারাও বিবৃতির মারফত 'সরকারীভাবে আমন্ত্রণ জানালে আলোচনায় বসতে রাজী' বলে জানাচ্ছেন। কিন্তু এ নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত কোন কার্যকর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

'যুব সমিতির দাবি না মানলে ত্রিপুরাকে আসাম বানিয়ে দেওয়া হবে।' এই ঘোষণা সমতলবাসী উপজাতি সম্মেলনের। নভেমবর মাসের প্রথম সপ্তাহে আসামে অনুষ্ঠিত সমতলবাসী উপজাতি সম্মেলন ঘোষণা করেন—সরকার যদি উপজাতি যুব সমিতির দাবিসমূহ পূরণ না করেন তবে তারা ত্রিপুরাতেও দ্বিতীয় আসাম সৃষ্টি করে দেবার সংগ্রামে নামবেন। ঐ সম্মেলনে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি ও উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের একদল প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন বিধায়ক হরিনাথ দেববর্মা। উনি দাঙ্গার পর জুন মাস থেকেই পলাতক। রাজ্য পুলিশ এবং গোয়েন্দা দপ্তর শ্রীদেববর্মাকে গ্রেপ্তারের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে, কিন্তু তাঁর টিকিরও নাগালও পাচ্ছে না। অন্য দিকে শ্রীদেববর্মা উপজাতিদের আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করছেন। অন্য রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। উগ্রপন্থীদলের নেতা এবং সেকেনড কমানডার ইন চীফ চুনী কলই-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে রাজ্যে সশস্ত্র আঘাত হানার ও প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। পলাতক বিধায়ক হরিনাথ দেববর্মা বিভিন্ন পুস্তিকা ছাপিয়ে গোপনে প্রচারের ব্যবস্থা করছেন হরিনাম দেববর্মা লিখিত 'ত্রিপুরায় গণহত্যার জন্য মান্দাই কি একমাত্র সাক্ষী ?' পুস্তিকাটি যুব সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যেই বণ্টন করা হয়েছে। পুস্তিকাটি দারুণ উত্তেজক। ১৭ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটির শেষ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে —'যতদিন পর্যন্ত উপজাতিদের হাতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার, স্বনির্ভরশীল বাণিজ্য, নিয়ন্ত্রণ ও বহিরাগতদের প্রভাবমুক্ত শাসন ক্ষমতা না আসবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে।'

উপজাতি যুব সমিতির প্রথম সারির নেতাদের অনেকে জুন মাসে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাদের অনেকেই এখন জামিনে মুক্ত। তারাও কিন্তু বসে নেই। তারা এখন জনমত সৃষ্টিতে ব্যস্ত। যুব সমিতির অন্যান্য নেতা—নগেন্দ্র জমাতিয়া, শ্যামাচরণ ত্রিপুরা বা বুদ্ধ দেববর্মা এখনও জনসমাবেশ মঞ্চে উঠেননি, কিন্তু গোপন সভা চলছে। চলছে রাজনৈতিক সমঝোতা। বিশেষ করে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা বা কংগ্রেস (ই) দলের রাজ্যস্তরের নেতাদের সঙ্গে গোপন আঁতাতের চেষ্টাও চলছে।

উপজাতি যুব সমিতির উগ্রপন্থী নেতা বিজয় রাংখল এখনও কারান্তরালে। কিন্তু শ্রীরাংখলের সহযোগী তথা টি এন ভি (ত্রিপুরা ন্যাশনেল ভলানটিয়ারস) দলের সেকেনড কমানডার ইন চীফ চুনী কলই এবং তাঁর দল সহিংস আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। জুন মাসের মত গণহত্যা হয়তো আর হবে না, কিন্তু চোরাগোপ্তা খুন ইত্যাদি চলছে। উগ্রপন্থী দল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পার্বত্য এলাকার 'লঙকুঙ' স্থানটি নিরাপদ দুর্গ হিসাবে বেছে নিয়েছে। এ তথ্য সরকারের কাছেও আছে। চুনী কলই-এর নেতৃত্বে প্রায় আড়াইশ উগ্রপন্থী দল একদিকে উপজাতি জনগণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করছে, অন্য দলটি দেশী বন্দুক, পাইপগান এবং গোলাবারুদ তৈরি করছে। আবার উত্তর ত্রিপুরার ভাংমুন জম্পুই পাহাড়ের নিকট কিছু উগ্রপন্থী অস্ত্রশস্ত্রে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। শীঘ্রই তারা উত্তর ত্রিপুরা জেলায় আঘাত হানবে। আঘাতের লক্ষ্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য থানা আক্রমণ এবং খাদ্য ও অর্থের জন্য গ্রাম এবং বাজারে লুটপাট। উগ্রপন্থীরা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহেও ব্যস্ত। এ তথ্য সরকারের কাছে আছে। ত্রিপুরাবাসীরও তা এখন আর বুঝতে বাকি নেই।

ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি কেন সহিংস ও অহিংস আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে? তা কি শুধু ১৯৪৯ সালের ১৫ অকটোবরের পরে আগত অ-উপজাতি 'বিদেশী' বিতাড়নের উদ্দেশ্যে না কি স্বাধীন ত্রিপুরা গঠনের উদ্দেশ্যে? কিন্তু রাজ্যে যেভাবে অনবরত রক্ত ঝরছে তার শেষ কোথায় উৎসই বা কোথায় ★

খুলনা জেলে সত্যিই কী ঘটেছিল

সৌমিত্র ঘোষ দস্তিদার

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন বেশ অস্থির। দেশজুড়ে মিছিল, মিটিং, হরতাল—প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জিয়াউর রহমান সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অসন্তোষ যত বাড়ছে, ততই সরকার বিরোধীরা জনমতকে নিজেদের দিকে নিয়ে আসার নতুন পন্থা খুঁজছেন। এ চেষ্টা প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে খুলনা জেল সংঘর্ষের পরে।

সব বিরোধী দলেরই অভিযোগ : একুশে অকটোবর, ঈদ-উল-আজহারের শেষ রাতে পুলিশ ও আনসারবাহিনী পরিকল্পিতভাবে লাঠি গুলি বেয়নেট দিয়ে খুলনা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে কয়েকশো বন্দীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। কোন মৃতদেহই আত্মীয় পরিজনের হাতে দেওয়া হয়নি। পুলিশ অনেক লাশ নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। সঠিক তথ্য যাতে কেউ জানতে না পারে তার জন্য রাজনৈতিক নেতা এবং সাংবাদিকদের জেলের আশপাশেও যেতে দেওয়া হয়নি।

সরকার অবশ্য এসব বক্তব্য পুরোপুরি অস্বীকার করেছে। বেতার দূরদর্শন ও সরকারী প্রেস নোটে বলা হয়েছে—ঈদের রাতে খুলনা জেলে দু'দল কয়েদীর মধ্যে সংঘর্ষে চৌত্রিশ জন বন্দী নিহত ও বেশ কিছু আহত হয়। মৃতের সংখ্যা শেষ অবধি বেড়ে ঊনচল্লিশে দাঁড়ায়। সরকারী বক্তব্য হল—পুলিশ শুধু অবস্থা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেছিল।' ঐ ঘটনার নিয়ে তদন্তের জন্য একজন বিচারপতিকে নিয়ে কমিশনও গঠন করা হয়েছে।

সরকারী বক্তব্য কিন্তু ওদেশের বেশির ভাগ সংবাদপত্রই মানতে পারেনি। মৃতের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ থাকলেও 'ইত্তেফাক', 'দৈনিক সংবাদে'র মত নামী কাগজেও ঘটনার দিন দুই পরে (ঈদের জন্য সমস্ত সংবাদপত্র একুশ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ ছিল) প্রথম পাতায় ফলাও করে 'খুলনা জেল হত্যার' খবর বের হয়। অকটোবর 'দৈনিক সংবাদে'র নিজস্ব প্রতিবেদক 'জেল গেটে এখনও ভিড় জমে'—এই শিরোনামে কয়েদীদের প্রিয়জনদের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয় 'জেলে যারা ছিলেন তাদের বেশিরভাগেরই কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। তাই কে কেমন আছেন তা নিয়ে আপনজনের উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে।'

তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য জানিয়েছিল 'সাপ্তাহিক খবর' ও 'সত্যকথা' শেষ পাতায় লাশের প্রচুর ছবি ছাপিয়ে ও 'জেল হত্যার আসল রহস্য' ফাঁস করে দিয়ে। এসবের পাশাপাশি 'দৈনিক বাংলা'র ছাব্বিশে অকটোবরের খবর বেমানান লাগতে পারে। ওরা নিতান্ত দায়সারাভাবে জানিয়েছিল—'খুলনা জেলে কয়েদীদের পারস্পরিক সংঘর্ষে ছত্রিশজন বন্দী প্রাণ হারিয়েছে।' দৈনিক বাংলা স্বীকৃত সরকারী দৈনিক।

খুলনা জেলের আসল ব্যাপারটা কী তা জানার জন্যে আমি ওদেশের অনেক সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক কর্মী, নেতা ও বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে কথা বলেছি। খুলনা গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকেও আসল কথা শোনার চেষ্টা করেছি।

ঘটনার পরেই খুলনা থেকে ফিরে এসে জাসদ (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) সংসদীয় দলের নেতা জনাব সাজাহান সিরাজ বলেছিলেন—'খুলনা জেলে পুলিশ কমপক্ষে দু'শ বন্দীকে হত্যা করেছে।'

খুলনার পুরনো কবরখানা রোডের কাছাকাছি এক হোটেলের সাধারণ কর্মীরা আমাকে বলেছেন—তারা লাশ ভর্তি চৌদ্দটি ট্রাক রাতের অন্ধকারে খান জাহানআলী রোড দিয়ে ভৈরব নদীর দিকে যেতে দেখেছেন।

আটাশে অকটোবর আওয়ামী লীগ (মালেক) ও জাসদসহ দশ দল একসঙ্গে সারাদেশে বেলা বারোটা পর্যন্ত এবং সাম্যবাদী দল (এম এল) মহঃ তোয়াহা গোষ্ঠীর নেতৃত্বে আরও পনেরটি দল একই দিনে আলাদাভাবে বেলা দুটো অবধি সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেয়।

বাংলাদেশের জেলে বন্দী হত্যা নতুন ঘটনা নয়। হাল আমলে, মাস তিনেকের মধ্যে ময়মনসিং এবং রাজসাহী জেলের সংঘর্ষেও বেশ কিছু বন্দী প্রাণ হারিয়েছে। সরকারী মতে ঐ দুই জেলে মৃত্যুসংখ্যা মাত্র ৯; বেসরকারী মতে শ'দুই। সরকার সবক্ষেত্রেই ব্যাপারটা নেহাৎই দু'দল বন্দীর পারস্পরিক কলহের জের বলে চালাবার চেষ্টা করেছে।

জাতীয় সাপ্তাহিক 'সত্যকথা' জানিয়েছে 'বারই অকটোবর মান্নান নামে এক বন্দীকে ঝালকাঠি জেলে অপসারণের পরে চব্বিশ দফা দাবির ভিত্তিতে বন্দীদের আন্দোলন শুরু হয়। তারা জনৈক ডেপুটি জেলার সহ কুড়িজন কারাকর্মীকে জিম্মি (মুক্তিপণ) হিসেবে আটক করে। ঘটনার নবম দিনে জেলখানার অভ্যন্তরে পুলিশী অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হয়।'

বন্দীরা শুরু থেকেই সাম্যবাদী দলের



আমাদের শীতের সঙ্গে বোধ হয় ক্রিকেটের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। শীতের সঙ্গে ক্রিকেটও এসে পড়ে। এবার অবশ্য কলকাতায় বা ভারতে টেস্ট ক্রিকেট নেই।

কিন্তু বাংলা ক্রিকেটের পালনকর্তা সি এ বি—ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের, সুবণ জয়ন্তী। এই জয়ন্তী ঘিরে কলকাতায় উৎসব চলবে দু'মাস ধরে।

এই উপলক্ষে ডিসেম্বরে আমরা একটি বিশেষ ক্রিকেট সংখ্যা বের করছি—নানা ধরনের মূল্যবান রচনা ও ছবির সমাবেশে। আকারে সাধারণ সংখ্যার চাইতে অনেক বড় হবে। দাম : আড়াই টাকা।

যারা এই মূল্যবান সংখ্যাটি পেতে চান, তারা আজই স্টলে বা হকারকে বলে রাখুন।

বিজ্ঞাপনদাতারা এখনই আমাদের বিজ্ঞাপন ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

খেলার আসর

পরবর্তী আকর্ষণ

বিয়রন বর্গ টেনিসের বিস্ময়



লিখেছেন ঃ আর্য কুমার সরকার

বয়স মাত্র চব্বিশ, কিন্তু এরই মধ্যে টেনিস বিশ্বে প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি হতে চলেছেন বর্গ। তার মত কম বয়সে কেউ উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হন-নি। টেনিস জগতে তিনিই এখন সবচেয়ে ধনী! সারা বিশ্ব তাকে এক ডাকে চেনে, জানে। একদা পেলে যেমন মাতিয়েছিলেন, প্রায় তারই মত জনপ্রিয় এই বর্গ। কেমন খেলোয়াড় বর্গ, কিভাবে, কেমন অধ্যবসায় দ্বারা আজ শীর্ষে পৌঁছেছেন। সারাদিন কি করেন খেলার সময়ে বা অফ-সিজনে ?

টেনিসের বিস্ময়—বিয়রন বর্গের শৈশব থেকে ইত্যাকার নানা ঘটনা নিয়ে শীঘ্রই 'খেলার আসর'-এ প্রকাশিত হতে চলেছে ধারাবাহিক রচনা—

সঙ্গে মনমাতানো অসংখ্য ছবি।

মহম্মদ তোয়াহা, ইউ পি পি-র কাজী জাফর, ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন, জাসদের মেজর জলিল ও আওয়ামী লিগের মালেক উকিলের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাদের নেতৃত্বের প্রতিও পূর্ণ আস্থা ঘোষণা করেছিলেন। আন্দোলনকারী বন্দীরা এদের বাদ দিয়ে আলোচনায় বসতে বা সমঝোতায় পৌঁছাতে রাজি হননি। কিন্তু এই নেতারা ঐ নয় দিনই সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। খুলনার জেল ঘটনা নিয়ে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতিও কেউ দেননি।

এখন তাহলে নেতারা হত্যা নিয়ে হঠাৎ সরব হচ্ছেন কেন আগে কি বন্দীদের প্রতি ওদের কিছুমাত্র আস্থা ছিল না ? আগে যদি ওরা চেষ্টা চালাতেন তাইলে কি এত প্রাণ এভাবে চলে যেত ?—এ জিজ্ঞাসা যত বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে ততই বন্দীহত্যাকে কেন্দ্র করে বিরোধীপক্ষের আন্দোলনের তেজ কমে যাচ্ছে।

কয়েদীদের আন্দোলনের কারণ কি ? এর পেছনে কি কোন রাজনৈতিক শক্তি আছে পুলিশ কিভাবে বন্দী হত্যা করেছে ? বাংলাদেশের বিভিন্ন মহলে সব প্রশ্নের জবাব পেতে চেষ্টা করেছি। অনেকে অনেক কথা বললেও সারটুকু হল এই—বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি কারাগারে বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন মাথা চাড়া দিচ্ছে বারবার। বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের শাসন-শোষণের সুবিধের জন্যে তৈরি পীড়নযন্ত্রের অন্যতম এই কারা ব্যবস্থা পুরোনো আইন ঔপনিবেশিক যুগের সমস্ত বর্বরতা নিয়ে এখনও অটুট। বন্দীদের মানুষ ভাবার কোন অবকাশ কারা প্রশাসনে নেই।

কী চান বন্দীরা ? সরাসরি ওদের দাবি-সনদের অংশ তুলে দিচ্ছি ঃ

(১) পনেরো দিনের মধ্যে চার্জশীট অথবা 'ফাইনাল' থানা কর্তৃক প্রদান করিতে হইবে এবং তিন মাসের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করিতে হইবে, অন্যথায় জামিন দিতে হইবে।

(২) তিন মাসের ঊর্ধ্বে হাজত বাসের মেয়াদ যাহাদের হইয়াছে, তাহাদের সকলকে এখনই জরুরি ভিত্তিতে জেল গেটে জামিনে মুক্তি দিতে হইবে।

(৩) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চার্জশীট বা বিচার বা জামিন দিতে না পারিলে মামলা বাতিল ঘোষণা করিতে হবে।

(৪) পাকিস্তান আমল হইতে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত ফৌজদারি মামলার বিচার এ-পর্যন্ত স্থগিত আছে বা চলিতেছে সেগুলি অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে।

(৫) একই মামলার ফেরারী আসামীকে বাদ দিয়া হাজিরার আসামীকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিচার করিতে হইবে।

(৬) আসামীকে কারাগারে আনার পর পুনরায় পুলিশ হেফাজতে নেওয়া চলিবে না প্রয়োজনে জেল গেটে আসিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হইবে।

(৭) মৃত্যুদণ্ড প্রথা সম্পূর্ণ রূপে বাতিল করিতে হইবে।

(৮) প্রতি পনের দিনে মহকুমা প্রশাসক অথবা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে এবং প্রতি এক মাস অন্তর জেলা প্রশাসক ও বিচারপতি-গণকে কারাগার পরিদর্শনে আসিতে হইবে।

(৯) সকল রাজবন্দীকে রাজনৈতিক মর্যাদা দিতে হইবে।

(১০) কারাগারে ধারণ ক্ষমতার বাহিরে কোন আসামীকে কারাগারে রাখা চলিবে না।'—ইত্যাদি।

নির্ভরযোগ্য সূত্র খবর ঃ খুলনা জেলে শ' আড়াই বন্দীর জায়গা হয় সেখানে ঘটনার দিন রাখা হয়েছিল ন'শো দশ জনকে। তাদের মধ্যে ছিল মেয়ে কয়েদী বত্রিশ, ফাঁসীর আসামী তেইশ, রাজবন্দী একশ' সাত। বাদবাকি সবাই দীর্ঘদিন ধরে জেলে রয়েছেন।' এক সাংবাদিক বন্ধু জানিয়েছেন—বন্দী হত্যা অভিযানে হাজারখানেক রিজার্ভ পুলিশ ও বিদেশী ছাপমারা এক ধরনের রাবার বুলেট ব্যবহার করা হয়।

কয়েদীদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক শক্তি কাজ করেছিল কিনা বলা মুস্কিল। জিয়ার নিজস্ব দল, বি এন পি-র কিছু নেতার মতে—'আওয়ামী লীগই (ওদেশে যাদের পরিচিতি বাকশাল বা বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগরূপে) হাঙ্গামা বাধিয়ে সরকারকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে।'

অনেক বামপন্থী দলও জেল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে ঠারেঠোরে বোঝাতে চায়। খুলনা জেল বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক যশোরের ছেলে শহীদ জয়দেব দে মাধব। সরকার তাঁকে সমাজবিরোধী বলে প্রচার করেছিল। নকশালপন্থী একটি গোষ্ঠী তাঁকে নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বলে দাবি করেছে।

১৯৫০ সালের চব্বিশে এপ্রিল রাজশাহী জেল হত্যা সম্বন্ধে ইন্দু সাহা লিখেছিলেন—'পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত জঘন্যভাবে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে, খাপড়া ওয়ার্ডের একটি শেলের মধ্যে বন্দী করে, শিকের ফাঁকে রাইফেল বসিয়ে সাতজন বিপ্লবী দেশ প্রেমিককে কুকুরের মতো গুলি করে হত্যা করে। এরা সবাই কৃষক সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আজও খাপড়া ওয়ার্ড হত্যাকাণ্ডের খবর এই উপমহাদেশের খুব কম মানুষই জানেন। আজও শহীদ আনোয়ার হোসেন, কম্পোরাম সিং, মুহম্মদ হানিফ, সুখেন, সুধীন, দেলোয়ার হোসেন ও বিজনের আত্মত্যাগ সফল হয়ে ওঠেনি।' কবে হবে ? কে জানে! ★

জটিঙ্গায় পাখিরা আত্মহত্যা করে কেন ?

সাধন ব্রত দাস

আসামের নর্থ কাছাড় হিলস জেলার সদর শহর হাফলং। আবহাওয়া, ফলমূল, অর্কিড ও দুষ্প্রাপ্য গাছপালার জন্য এ শহর ভ্রমণ বিলাসীদের কাছে একান্ত প্রিয়।

হাফলং শহরের কিছু দক্ষিণে অবস্থিত এক গ্রাম সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বারেল পর্বতের পাদদেশে ও জয়ন্তীয়া উপত্যকায় অবস্থিত এই গ্রামের নাম জটিঙ্গা। সমগ্র অঞ্চলটির উচ্চতা প্রায় ৭৩৬ মিঃ। প্রায় দু' বর্গ কিলোমিটার জুড়ে থাকা এই গ্রাম জয়ন্তীয়া, কাছাড়ি, গারো আদি উপজাতি দ্বারা অধ্যুষিত। অঞ্চলটির জনসংখ্যা প্রায় ১২০০।

১৯০৫ সালের এক মেঘাচ্ছন্ন রাতে হারিয়ে যাওয়া গরু খুঁজতে এসে স্থানীয় কয়েকজন উপজাতি রাখাল এক রহস্যময় ব্যাপার লক্ষ্য করে। গরু খুঁজে না পেয়ে ওরা ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ নানান স্থান থেকে নানা প্রজাতির পাখি তাদের কেন্দ্র করে উড়তে শুরু করে এবং গ্রামবাসীদের হাতের মশালের আলো লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করে। গ্রামবাসীরা প্রথমে বিস্মিত হলেও পরে ঈশ্বর প্রেরিত খাদ্য ভেবে পাখিগুলিকে গ্রহণ করে।

পাখিদের এই আত্মহত্যা কেবল এক নির্দিষ্ট স্থানেই ঘটতে দেখা যায়। জটিঙ্গা ছাড়া ভারতের কোথাও পাখিদের এভাবে আত্মহত্যা করার কথা শোনা যায়নি।

অনুসন্ধানের পর দেখা গেছে প্রায় ৩০টি স্থানে যে কোন কৃত্রিম আলোক রাখার পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে পাখিদের ঝাঁক আসা শুরু হয়। তারা আলো কেন্দ্র করে চক্রাকারে উড়তে শুরু করে। অবশেষে আলো লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এখন পর্যন্ত আঠারো রকম প্রজাতির পাখিদের এভাবে আত্মহত্যা করতে দেখা গেছে। অনেক যাযাবর পাখি ছাড়া পায়রা, দোয়েল, ঘুঘু, কোয়েল, মাছরাঙ্গা, বুলবুল, কাঠঠোকরা ও বদ্রী পাখিকে এভাবে বলি হতে দেখা গিয়েছে। পাখিদের আচরণ লক্ষ্য করলে বোঝা যায়—তারা যেন এক গভীর মোহে আচ্ছন্ন।

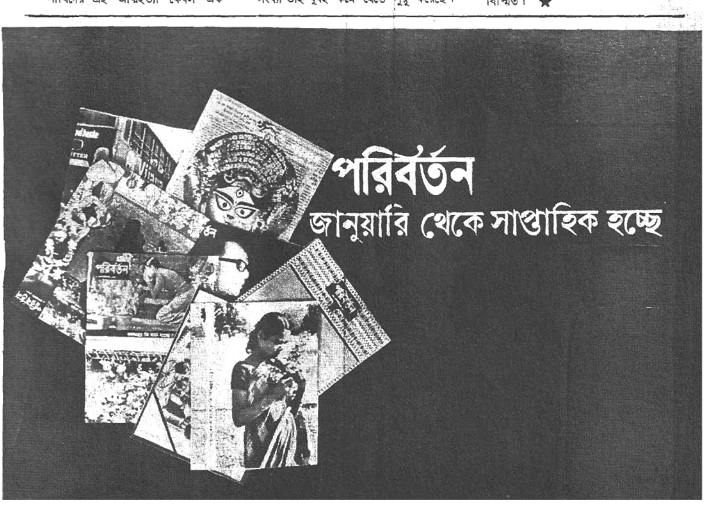
পাখিদের এই প্রবৃত্তির পূর্ণ সদব্যবহার করে জটিঙ্গার আদিবাসীরা। তারা কয়েকটি বিশেষ স্থানে কৃত্রিম আলোক রেখে পাখিদের আকৃষ্ট করে। ঝাঁকে ঝাঁকে আলো কেন্দ্র করে ওড়াকালীন বাঁশের তৈরি এক বিশেষ অস্ত্র দিয়ে ওরা পাখিদের হত্যা করে। হাফলং ও পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেরা এভাবে পাখি শিকার করতে জটিঙ্গায় প্রায়ই আসতে শুরু করেছে। জটিঙ্গায় পাখির সংখ্যা তাই খুবই কমে যেতে শুরু করেছে। সরকার জটিঙ্গায় পাখি হত্যা করা বে-আইনী ঘোষণা করেছেন ; কিন্তু আজও পাখি হত্যা সমানে চলেছে।

বর্ষা এবং শরৎ-এর মাঝামাঝি পাখিদের এ প্রবৃত্তির বলি হতে দেখা যায়। এ সময় জটিঙ্গার বাজারে প্রচুর মৃত পাখি বিক্রি হয়। সরকার পাখি হত্যা বে-আইনী ঘোষণা করায় জটিঙ্গার আদিবাসীরা বেশ ক্ষুব্ধ।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজ্ঞানীরা জটিঙ্গায় এসে অনুসন্ধান করেছেন ; তবে নির্দিষ্ট কোন কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। তবে বিজ্ঞানীরা একটি বিষয়ে একমত ঃ পাখিদের এই ব্যবহারের সঙ্গে প্রকৃতির যোগসূত্র রয়েছে। কিছু প্রাকৃতিক অবস্থার সমন্বয় হলে পরেই কেবল পাখিদের এই অস্বাভাবিক ব্যবহার করতে দেখা যায়। এই সব প্রাকৃতিক অবস্থা হল যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত, অন্ধকার রাত্রি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, জোরালো হাওয়া (দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে) ও ঘন কুয়াশা।

এসব প্রাকৃতিক অবস্থার সমন্বয় হলে, জটিঙ্গা রেল স্টেশন ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যবর্তী যে কোন স্থানে কৃত্রিম জোরালো আলোক রাখলে পাখিদের অদ্ভুত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পেটরোম্যাকসকে আলোকের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ঐ প্রাকৃতিক অবস্থার কোন একটির অভাব ঘটলে পাখিদের আসতে দেখা যায় না।

ওদের এই রহস্যময় আচরণে বিজ্ঞানীরা বিস্মিত। ★




আপনার পরিবারের জন্য
একমাত্র বনস্পতি
KUSUM
VANASPATI
ENRICHED WITH VITAMINS A & D
2 Kg. Nett
A Kusum Product
KUSUM PRODUCTS LIMITED
9 BIPLABI TRAILAKYA MAHARAJ SARANI
CALCUTTA-700001
পরিবারের সকলের জন্য
সবরকম রান্নার উপযোগী
কুসুম বনস্পতি ।
স্বাদে, গন্ধে রান্নার সব
উপকরণের পুরো গুণটুকু
শেষ পর্যন্ত বজায় রাখে ।
কুসুম
ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি'
দ্বারা সমৃদ্ধ এবং
বাছাইকরা উপাদানে তৈরী
কুসুম বনস্পতি আপনার
সবরকম রান্নায় সব
সময়ে কাজে লাগবে ।
A Kusum Product
ACI/KPV/1-80 B



মৃণাল সেনের ২৫ বছর

নির্মল ধর

আটচল্লিশ কি উনপঞ্চাশ সাল। উত্তরপ্রদেশের গ্রামে আর শহরে এক বাঙালী তরুণ ওষুধ ফিরি করে বেড়ান। ক্লান্তিকর ছকে বাঁধা জীবন। হঠাৎ ঝাঁসিতেই ঘটনাটা ঘটল।

দিনের শেষে একদিন সাইকেল রিকসা করে একটা সুন্দর জায়গায় হাজির হয়েছেন সেই তরুণ। অচেনা অজানা জায়গা। চারিদিকে ছোট-বড় পাথরের ঢিবি, চাঁই। কেমন নেড়া নেড়া ভাব। শূন্যতা যেন গিলতে আসছে। আকাশে শেষ ছটা ছড়িয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কোন শব্দ নেই কোথাও। কেমন 'মন-বিষণ্ণ-করা' পরিবেশ। নির্মানব নৈসর্গিক সৌন্দর্যে তরুণটি যেন হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছিলেন নিজেকে। হৃদস্পন্দন যেন নিজেই শুনতে পাচ্ছিলেন। ভেতরটা কেমন আগোছাল হয়ে উঠল। ভয়ংকর এক আকুলি-বিকুলি মনের মধ্যে। ঐ প্রাকৃতিক একাকীত্বটা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলেন না।

সেই দিন প্রায় ছুটেই সেই নীরবতার আগ্রাসী সৌন্দর্য ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন সেই তরুণ হোটেলের ছোট্ট ঘরটিতে। সেখানে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর আত্মবিশ্লেষণ। কী এক অব্যক্ত অসহনীয় আনন্দে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। হুটোপাটি করতে লাগলেন তিনি ঘরের ভেতর। জামা কাপড় খুলে সে এক কাণ্ড ঘটেছিল সেদিন।

'ভুবন সোম' ছবির একটি দৃশ্যে উৎপল দত্তের ঐ রকম উদ্ভট কার্যকলাপ কি তরুণ মৃণাল সেনের ঝাঁসির সেই সন্ধ্যাকেই মনে করিয়ে দেয় না?

অবশ্যই দেয়।

কিন্তু চল্লিশ দশকের শেষ দিকে মৃণাল সেন স্বপ্নেও বোধহয় ছবি করার কথা ভাবেননি। ঝাঁসির ঐ অভিজ্ঞতাকে তিনি কখনও অমন সুন্দর আর কাব্যময় করে ফিলমে তুলবেন সেটা তাঁরও জানা ছিল না। জীবনের ছোট ছোট এইসব অভিজ্ঞতা, পথ-চলতি কুড়িয়ে পাওয়া এমনি আরও অনেক ঘটনা, মানুষজন, পরিবেশ একবারে জীবন্ত হয়ে উঠে আসে আজকাল মৃণাল সেনের ছবিতে।

জন্মেছিলেন ফরিদপুরে ১৪ মে ১৯২৩। বাল্যস্মৃতি এখনও তাঁর বেশ স্পষ্ট। বছর দশেক বয়সের সময় 'বন্দে মাতরম' মিছিলে যোগ দিয়ে একবার পুলিশের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। আট-দশ দিন বাদে হাজত থেকে ছাড়া পেয়েছেন।

দ্বিতীয়বার মৃণাল সেনকে পুলিশ ধরেছিল কৈলাস বসু স্ট্রীটের ছাত্র-হোসটেল থেকে। ট্রাম পোড়ানোর অভিযোগ ছিল তাঁর নামে। আরও অভিযোগ ছিল স্টুডেনট ফেডারেশন করার। ছাত্রদের রাজনীতি করাটা তখন বোমার মত বিস্ফোরক। বেশ স্পষ্ট যৌবনের কণ্টকর অভিজ্ঞতার স্মৃতিও।

স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি এস সি পাশ করে (১৯৪২) মৃণাল সেনের হাতখরচ যোগাড় করতে হয় দু'বেলা টিউশানি করে। মনের মত চাকরির কোন খোঁজই নেই।

অগত্যা 'সিপলা' ওষুধ কোমপানির ফেরিওয়ালার 'চাকরি' নিয়ে চলে যান সুদূর ইউ পি-তে। সে 'চাকরি' বেশিদিন করতে পারেননি। মাত্র আট-ন' মাস। কিন্তু লাভ কম হয়নি। সেই অল্প সময়ের চকরি বাজিতেই বুকের মধ্যে, ফুসফুসের জালে অ-নে-ক অভিজ্ঞতার জীবাণু ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন।

চাকরি ছেড়ে আবার কলকাতায়। যোগ দিলেন এবার আই পি টি এ-তে। সময়টা ছেচল্লিশ কি সাতচল্লিশ। কলেজে পড়ার সময় থেকেই স্টুডেনট ফেডারেশন করার ফলে আই পি টি এ-র সঙ্গে যোগাযোগ ঘটতে অসুবিধে হয়নি।

নবান্ন-জবানবন্দী-ল্যাবরেটরি নাটক দেখেছেন গোগ্রাসী চোখে তৎকালীন রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। সেনট্রাল স্কোয়াডের সব বাঘা বাঘা লোক শান্তিরঞ্জন, রবিশংকর, বিজন ভট্টাচার্য কয়েক বছর আগে থেকেই সাংস্কৃতিক জগৎ আলো করে রেখেছেন। নাচ আর গানে তখন 'স্পিরিট অফ ইনডিয়া', রামলীলা', 'ইমমরট্যাল ইনডিয়া' গ্রাম-গঞ্জ শহর কাঁপিয়ে তুলছে।

মৃণাল সেন এইসব ঘটনা আর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আগ্রহী দর্শক। উত্তেজনার আগুনে মনকে চাঙ্গা করে নিচ্ছেন। নিরঞ্জন সেন, ভূপতি নন্দী, নির্মল ঘোষ, অতুল চৌধুরী সকলেই



'কোরাস' (১৯৭৫) / সুভাষ নন্দী

তাঁর সামনে, আই পি টি এ-র অরগ্যানাইজেশনে মৃণাল সেন নীরব কর্মী। নাটক-নাচ-গান কোনটাতেই সক্রিয় অংশ নেবার কথা ভাবেননি। অথচ মনে মনে কোথায় যেন ফিলম করার স্বপ্নটা লুকিয়ে ছিল।

ফিলম নিয়ে পড়াশুনো শুরু করলেন। ফিলমের টেকনিক, শিল্পতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব সবই গোগ্রাসে গিলছেন। প্রমাণ? ছড়িয়ে আছে উনপঞ্চাশ থেকে বাহান্ন সালের 'পরিচয়' পত্রিকায়, 'নতুন সাহিত্য'-র নানা সংখ্যায়। মৃণাল সেনের প্রথম লেখাটি বেরোয় ইন্দো-সোভিয়েত জারনালের '৪৬ সালের একটি সংখ্যায়। সম্পাদক ছিলেন হীরেন মুখার্জি। বিষয় ছিল 'ফিলম এনড দি পিপল'। সাতচল্লিশ সালের একটি রচনায় প্রমথেশ বড়ুয়ার 'চাঁদের কলঙ্ক' ছবিকে একেবারে তীক্ষ্ণ সমালোচনায় ধরাশায়ী করেছিলেন।

এখনও মৃণাল সেনের মতে প্রমথেশ বড়ুয়া খুব একটা বড় পরিচালক নন। 'বরং দেবকী বসু বা নীতিন বসুর ছবিতে জীবনের কথা আরও বেশি গভীর ভাবে পাই।'

মৃণাল সেনের মনে ফিলম মেকার হবার মাটি ততদিনে তৈরি হয়ে গেছে। ঋত্বিক ঘটক ওপার বাংলা থেকে ফিরে আই পি টি এ-তে যোগ দিয়েছেন, মেমবার হয়ে গেছেন কম্যুনিসট পারটির। মৃণাল সেন নীরব দর্শকই। মাঝে মাঝে কলম চালান।

হঠাৎ একদিন ঋত্বিক এসে বলল—'চল, ঘাটশিলায় শুটিং করে আসি।' নির্মল দে-র অসমাপ্ত ছবি 'বেদেনী'কে শেষ করার ভার পেয়েছিলেন ঋত্বিক ঘটক। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মৃণাল সেন একপায়ে রাজি। পাকা কুড়িটা দিন প্রভা দেবী, কেতকী দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য, মহর্ষির (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য) সান্নিধ্যে কাটিয়ে ফেরার পর উর্বরা মাটিতে যেন বীজ পড়ল।

ডি জি-র (ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী) কাছে সহকারী হয়ে কয়েক মাস কাটিয়েছেন সাতচল্লিশের শুরুতে। সাউনড রেকরডিসট শম্ভু সেনের কাছেও হাত পাকাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনটাই ঠিকভাবে শেখা হয়নি।

এদিকে কম্যুনিসট পারটি বে-আইনী ঘোষিত হয়ে গেল। আই পি টি এ-র কর্মীরা লুকিয়ে পড়লেন। স্বাধীনতার পর স্বদেশেই যেন নির্বাসিতের দিন কাটাতে লাগলেন অনেকে। যোগাযোগের বাঁধনগুলো ছিঁড়তে লাগল যেন। অন্তত আলগাতো হলই। বম্বে চলে গেলেন কেউ কেউ। দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গাঙ্গুলী, নবেন্দু ঘোষ, জ্ঞান মজুমদার, শোভা সেন, আরতি মিত্র, উৎপল দত্ত, ঋত্বিক—সকলেই রইলেন কলকাতায়। অথচ যোগাযোগ তেমন নেই।

লুকিয়ে লুকিয়ে শো করতে গিয়ে ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে যেতে হচ্ছে। নিত্য নতুন ' নাম দিয়ে ব্যানড নাটকের অভিনয় চলছে। মৃণাল সেনও আছেন। কিন্তু তাতে আর কতটুকু ব্যস্ত থাকা যায়? উত্তেজনার আগুনটা যেন নিভু নিভু।

নিজেরা নতুন দল করলেন। নাট্যচক্র। প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করা হল—'নীলদর্পণ'। পরিচালনার কাজে হাতে খড়ি তখনও হয়নি। উত্তরপাড়ায় 'জবানবন্দী'র শ্যাডো প্লে তাঁর প্রথম নাট্য পরিচালনা। আজকের শ্রীমতী মৃণাল সেন অর্থাৎ গীতা সেন তখন ঐখানকার বাসিন্দা। পরিচয় হয়েছে দুজনার কিছুদিন আগে। গীতা ওই শ্যাডো প্লেতে অভিনয়ও করেছিলেন।

এই সমীরণ দত্তই একদিন (বাহান্ন সাল নাগাদ) মৃণাল সেনকে নিয়ে গেলেন অভিনেত্রী সুনন্দা ব্যানারজির বাড়ি। বলেছিলেন—'এ'কে দিয়ে ছবি করাতে পারেন। ইয়ং ছেলে, কাজে ইনটারেসট আছে।' স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'রাতভোর'। প্রযোজকদের ইচ্ছেমত তাঁকে কাজ করতে হল। টগবগে তরুণ তিনি, ছবি করার ইচ্ছেয় উদ্বেল। গ্রাম থেকে শহরে আসা একটি কিশোরের স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের কথা খুব জোলো ভঙ্গিতে দেখানো হয়েছিল।

তিপ্পান্ন সাল নাগাদ ছবি শুরু করে শেষ করলেন পঞ্চান্নয়। রিলিজ হল ২১ অকটোবর। মাত্র দু' সপ্তাহ চলেছিল ছবিটি। আজকের মৃণাল সেনের প্রথম ছবি সম্পর্কে সেদিনের আনন্দবাজার লিখেছিল (২৮.১০.৫৫)—'ঘটনা ও চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য থাকলে তা রসসপুষ্ট নাট্যকাহিনীর উপযোগী হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে 'রাতভোর' সে বিষয়ে নেহাৎই অভাগা...গল্পটির মধ্যে এমন কিছু উপাদান নেই যার জোরে বেশ জমাটি কিছু গড়ে তোলা যায়। বিন্যাসও এমন কাঁচা যে জোর পায়নি কিছুই...আর বোঝা গেল না ছবির নাম কেন 'রাতভোর' হলো।'

আই পি টি এ, এস এফ, কমিউনিসট পারটির এত কাছাকাছি থেকেও মৃণাল সেন এমন এক শুধুই আবেগময় কাহিনী নিয়ে কেন ছবি করেছিলেন তার কারণ এখনও খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি নিজেও এই ছবিটিকে মনেপ্রাণে ভুলে যেতে চান। 'রাতভোর'-এর 'পিতৃত্ব'কে অনেক সময় অস্বীকার করেন।

১৯৫৫-এর মৃণালের সঙ্গে আজকের মৃণালের পার্থক্য যে কোন দর্শককেই বিস্মিত করবে। তাঁর চিন্তা, ছবি করার পদ্ধতি, তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণা সব বদলে গেছে আমূল। বদলে গেছে তাঁর ছবির সমালোচনার ভাষাও। ১৯৮০তে আনন্দবাজার পত্রিকা মৃণাল সেনের উনিশতম ছবি 'একদিন প্রতিদিন' সম্পর্কে লিখল:

'একদিন প্রতিদিন-এ প্রতিদিনের ঘটনা রয়েছে একদিনের ঘটনার পটভূমিতে, অনেকটা আবহের মতো. অথচ সেটা সুষম ও সংযত শিল্পের শর্ত লঙ্ঘন করে অতিমাত্রায় স্পষ্ট হয়ে কোন মুহূর্তে কয়েক-ঘণ্টার গল্পের উত্তেজনাকে গ্রাস করেনি।...ছবিটার একটা কড়িকোমল



'পদাতিক' (১৯৭২) / সুভাষ নন্দী

রূপও আছে, বিষয় যত কঠিন ও অকারণই হোক জায়গায় জায়গায় স্নেহ সহানুভূতি ও হার্দ্যরসের মুহূর্ত আছে। দৃশ্যত ছবিটি কাব্যময়। কাব্যিক মেজাজ **রয়েছে** ছবির পরিশীলিত প্রয়োগেও।...এবং **সব মিলিয়ে** ফিলম হিসাবে অর্থাৎ ফিলমিক কাজ বা চরিত্রের **দিক থেকে একদিন প্রতিদিন** এর অসামান্যতা তর্কাতীত। **কেউ কেউ এমনও বলতে পারেন, মৃণাল সেনের শ্রেষ্ঠ ছবি।** (১৫/৮/৮০)

মৃণাল সেন সারা ভারতে এখন সবচেয়ে বিতর্কিত পরিচালক। এটাই তাঁর বড় পরিচয়। এদেশের একমাত্র 'অতিস্পষ্ট' রাজনৈতিক পরিচালক তিনি।

'রাত ভোর' থেকে 'একদিন প্রতিদিন'-এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরের পথ-পরিক্রমা কোন দিনই মসৃণ ছিল না। এক একটা ছবি করার পর দু-তিন বছর তাঁকে চুপচাপ বসে কাটাতে হয়েছে। 'রাত ভোর' থেকে 'নীল আকাশের নীচে'র সময়ের ফারাক পাঁচ বছর, 'আকাশ কুসুম' থেকে 'ভুবন সোম' ও তাই। প্রতি পদে তাঁকে হোঁচট খেতে হয়েছে। আছড়ে পড়ে গেছেন মাটিতে। কোন প্রযোজক এসে কাঁধে হাত দিয়ে বলেননি —'ছবি করুন, আমি আছি।' ছবিগুলো প্রায় কোনটাই আর্থিক সাফল্যের মুখ দেখেনি। কিন্তু আবার তিনি গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অসাফল্যের কাঁটার মুকুট পরে মৃণাল সেন ঘুরে বেড়িয়েছেন রাজ্যে রাজ্যে। ওড়িষ্যা-অন্ধ্র-বোম্বাই। যেখানেই মনোমত সুযোগ পেয়েছেন, ছবি করেছেন।

বহুবারই ব্যবসায়ী প্রোডিউসাররা তাঁর কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়েছেন। তাদের শর্তে তিনি কোন দিনই ছবি করতে রাজি হননি বলেই এই অনীহা। যে কারণে 'অতিথি' বা 'সাত পাকে বাঁধা' ছবি দুটো করার অফার পেয়েও মৃণাল সেন করেননি। করতে চাননি। এবং সম্ভবত সেই কারণেই প্রযোজকরা তাঁকে সম্মানজনক দূরত্বে রেখে প্রায় হটিয়েই দিয়েছেন। একবারে 'বাতিল'-এর দলেও তাঁকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল দু-একবার।

'মৃগয়ার' মত সার্বিক সফল ছবি করার পরেও মৃণাল সেন এই কলকাতার প্রযোজকদের মন ছুঁতে পারেননি। তাই অন্ধ্র প্রদেশের এক উৎসাহী তরুণের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন ডাক পেয়ে। তৈরী হয়েছিল 'ওকা উরি কথা'। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ মৃণাল সেনের দিন কেটেছে নির্বাসনে। আর এরকম করেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পঁচিশ বছরে তাঁর ছবির সংখ্যা উনিশ।

আর এখন?

এখন ঠিক নয়, বছর দুই আগে থেকেই হাওয়া যেন ঘুরছে। বাম-ফ্রন্ট সরকার তাঁকে দিয়ে ছবি করিয়েছেন—পরশুরাম। হয়ত কিঞ্চিৎ বাজার দরও বেড়েছে মৃণাল সেনের। দেশ-বিদেশের নানা সম্মান স্বীকৃতির ফুলের ডালি আজ তাঁর মাথায়। প্রতি মাসেই প্রায় নিমন্ত্রণ আসছে কোন না কোন উৎসব থেকে। কোথাও বিচারক হবার অনুরোধ কোথাও বা বক্তৃতা দেবার আর্জি।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশই ঘোরা হয়েছে মৃণাল সেনের। কান, বারলিন, ভেনিস, মস্কো, লোকারনো, কারলোভ্যাভেরি, লনডন, টোকিও, হংকং কোথায় নয়? সর্বত্রই। এই তো নভেমবর মাসের মাঝামাঝি লনডনের ন্যাশনাল ফিলম থিয়েটার ওঁর তেরখানা ছবি নিয়ে এক উৎসব হয়ে গেল।

তাই বোধ হয় এখন হাতে গোনা কয়েকজন প্রযোজক ভাবছেন—'ব্যবসা নাই বা করতে পারল ওঁর ছবি! সম্মান পাওয়াটাই বা কম কি!'

একাধিক প্রযোজক এখন মৃণাল সেনের হাতে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে বলেন--'আপনার খুশি মত ছবি করুন। কোন আপত্তি নেই।'

মৃণাল সেনের ছবিই ভারতীয় ছায়াচিত্রে প্রথম রাজনৈতিক ওভারটোন আনল। শুরু 'ইনটারভিউ' দিয়ে। চলছে এখনও। বমবে, কর্ণাটক, কেরালার উঠতি চলচ্চিত্রকারদের অনেকেই মৃণাল সেনকে গুরু পদে বরণ করেছেন। সত্যজিৎ রায় এ'দের অনেকের কাছে চলচ্চিত্রশিল্পে নন্দন তত্ত্বের পুরোধা; আর মৃণাল সেন সমাজ সচেতন স্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনার বার্তাবহ।

২৫ বছরে ১৮

রাতভোর (রিলিজ তারিখ ২১ অকটোবর, ১৯৫৫), নীল আকাশের নীচে (১৯৫৯), বাইশে শ্রাবণ (১৯৬০), পুনশ্চ (১৯৬১), অবশেষে (১৯৬৩), প্রতিনিধি (১৯৬৪), আকাশ কুসুম (১৯৬৫), মাটির মনিষ (ওড়িয়া ১৯৬৬), ভুবন সোম (হিন্দি ১৯৬৯), ইচ্ছাপূরণ (১৯৭০), ইনটারভিউ (১৯৭০), এক আধুরি কহানী (হিন্দি ১৯৭১), কলকাতা ৭১ (১৯৭২), পদাতিক (১৯৭৩), কোরাস (১৯৭৪), মৃগয়া (১৯৭৬), ওকা উরি কথা (তেলুগু ১৯৭৬), পরশুরাম (এখনও মুক্তি পায়নি ১৯৭৮), একদিন প্রতিদিন (১৯৮০), নির্মীয়মাণ ছবি—আকালের সন্ধানে। স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি : মুভিং পারসপেকটিভ ও ত্রিপুরা।

মৃণাল সেনের বই

বাংলা : (১) ক্যারল চ্যাপেকের 'চিট' নাটকের অনুবাদ, (২) চ্যাপলিন, (৩) চলচ্চিত্রের ভূত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, (৪) চলচ্চিত্র ও আমি।

ইংরেজি : ভিউজ অন সিনেমা।

অর্থাৎ এক কথায় হাওয়া ঘুরছে। ঘোরাচ্ছেন মৃণাল সেন। **শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতের আঞ্চলিক ছবির চেহারা পালটাচ্ছে। মোরগের লেজ কাঁপতে কাঁপতে হয়তো উলটোমুখো হয়ে যাবে একদিন।** মৃণাল সেন তখন হবেন সেই হাওয়া বদলের ঘূর্ণিঝড়।



মৃণাল সেনের পরিচালক-জীবনকে আমরা সহজেই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি। (ক) শৈশব (১৯৫৫-৬৩)। এই পর্যায়ের শুরু 'রাতভোর' দিয়ে। শেষ ছবি 'অবশেষে' (১৯৬২)। ফিলম মাধ্যমের গুরুত্ব সম্পর্কে শ্রীসেন তখনও গভীর কোন উপলব্ধিতে পৌঁছাতে পারেননি। (খ) কৈশোর (১৯৬৪-১৯৬৯)। এ পর্যায়ের প্রথম ছবি 'প্রতিনিধি'। একে ট্রানজিশন পর্যায়ও বলা যায়। এর পরিণতি 'ভুবন সোমে' (১৯৬৯)। (গ) ভুবন সোমের পরবর্তী যৌবন পর্যায় যার এতাবৎ পরিণতি 'একদিন প্রতিদিনে'।

কৈশোর পর্যায়েই শ্রীসেনের মননে প্রথম বাস্তব জীবনের ছোঁয়া লেগেছিল। সত্যজিৎ রায় তত্দিনে 'দেবী' পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন। তরুণ মৃণাল সেনের 'বাইশে শ্রাবণ' রিলিজ করল ষাট সালের মাঝামাঝি। এক গরীব ফেরিওয়ালার জীবন সংগ্রাম বাস্তব রূপ পেয়েছিল সেই ছবিতে। পটভূমি দুর্ভিক্ষের সময়। বাড়িতে রয়েছে তার বৌ, প্রেমিক, রোমান্টিক মন তার। চারদিক থেকে আর্থিক সংকট তাকে ঘিরে ধরছে, দুঃসময়ের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এ অবস্থায় নায়কের ট্রাজেডি যেন সার্বজনীন ব্যাঞ্জনা পেল। আরট ফিলম হিসাবে প্রায় ফুলমারকস দেওয়া হয়েছিল 'বাইশে শ্রাবণ'কে। শুধু বক্তব্য নয়, আংগিকের দিক থেকেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল ছবিটি।

ওই ছবিতেই মৃণাল সেন প্রথম আজকের 'মৃণাল সেন' হবার প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার ঘনীভবনও তখন থেকেই শুরু।

এই পিরিয়ডের অন্য ছবিগুলোর দিকে চোখ ফেরালেও একই সমস্যার নানামুখ নানা দিক থেকে দেখতে পাবো। মৃণাল সেনও তাই চেয়েছিলেন বোধহয়। আধা সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় মধ্যবিত্ত পরিবারের আধা সামাজিক সংকটের বিষয়টিকেই তিনি একের পর এক ছবিতে তুলে ধরেছেন। সমাধানের কোন ইঙ্গিত



কোথাও ছিল না, বিপ্লবের কথাতো দূরে থাকুক। আসলে রাজনৈতিক ফারমেন্টেশন চলছিল ভেতরে ভেতরে।

তখন থেকেই তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন বিখ্যাত ফরাসী-মেক্সিকান পরিচালক লুই বুনুয়েলের এই কথাগুলো : 'If it were possible for me, I would make films which apart from entertaining the audience, would convey to them the absolute certainty that they do not live in the best of all possible worlds…' মার্কসবাদে দীক্ষা নেওয়াও হয়ে গেছে। জীবনের শুধু নয়, সামাজিক সমস্যার দ্বান্দ্বিক সত্যগুলোকেও তিনি উপলব্ধি করেছেন।

সেই উপলব্ধি থেকেই জন্ম নিয়েছিল 'পুনশ্চ' (৬১) ছবিটি। আগের ছবির গ্রাম্য পরিবেশ ছেড়ে শহরের মানুষের দৈনন্দিন সমস্যায় তিনি হাত দিয়েছিলেন। একটি তরুণ-তরুণীর প্রেমের গল্প। কিন্তু তার মূলকেন্দ্র অর্থনৈতিক সংকট। পুরুষপ্রধান সমাজে মেয়েরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেলে, রোজগার করতে শুরু করলে তাদের প্রেমিক বা স্বামীর চিন্তাধারা কেমন পাল্টে যায়, কেন সংঘাত সৃষ্টি করে—এসবের মধ্য দিয়ে পুরুষ কিরকম বেশি প্রাজ্ঞ হয়ে নতুন জীবনকে, নতুন বাস্তবকে মেনে চলতে বাধ্য হয় বা চায় এই ছিল বিষয়বস্তু। অর্থাৎ জীবনের দ্বান্দ্বিক সত্য ও রূপ। ছবিটি হয়েছিল পরিচ্ছন্ন, আলগা বাঁধুনিতেও বেশ ছিমছাম। কিন্তু 'বাইশে শ্রাবণে'র মানবিক উত্তরণ ছিল না ছবিতে।

তাই 'পুনশ্চ' মৃণাল সেনের একটা মেজর ছবি হতে গিয়েও হতে পারেনি। প্রয়োগকর্মেও তেমন কোন সৌন্দর্য চোখ কাড়তে পারেনি। গল্পের তলায় তলায় যে রাজনৈতিক বোধ ও মেজাজ ছিল তা কখনই ছবির ওপর উঠে আসতে পারেনি। ফলে ছবিটি আলোড়ন তুলতে পারল না।

'প্রতিনিধি' (১৯৬৪) মৃণাল সেন করেছিলেন সময়ের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে। 'আমরা যে সবচেয়ে সুন্দর পৃথিবীতে বাস করছি না'—এই সত্যটা তিনি তখন গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর সংঘাত ও সে কারণে বিচ্ছেদ ছিল ওই ছবির কেন্দ্রবিন্দু। নাগরিক সভ্যতার একটা বিকট সমস্যা—বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ সংসারিক শুধু নয়, মানসিক দিকেও কতখানি ছায়া ফেলে, প্রথম পক্ষের সন্তান তার 'নতুন' বাবা বা মাকে কিভাবে গ্রহণ করে বা করে না সেটাকে মৃণাল সেন দেখিয়েছিলেন পরিষ্কারভাবে দুটি স্তরে। একটি স্তরে সমস্যাটি ছিল স্বামী-স্ত্রীর। অন্য স্তরটি ছিল শিশু সন্তানের পার্সপেকটিভ।

তবে 'পুনশ্চ'র মত এ ছবিতেও শৈল্পিক সৌন্দর্যের অভাব ছিল। জীবনের কথা বলা হলেও জীবনের স্পন্দনটা যেন অনুপস্থিত। প্রাণহীন প্রতিমার মত। 'প্রতিনিধি' বিষয় এবং বক্তব্যে অনেক বেশি ডায়নামিক, বোল্ড হয়েও আঘাত করতে পারল না দর্শকদের। যেমনটি করেছিল 'আকাশ কুসুম' (৬৫)।

আগুনে ঘি ফেলেছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। তিনমাস ধরে মৃণাল সেন, সত্যজিৎ রায়, চিত্রনাট্যকার আশিস বর্মণের মধ্যে স্টেটসম্যান পত্রিকায় সে কি চিঠি চালাচালি! এ ছবিতে একজন উচ্চাভিলাষী যুবকের ভয়ংকর ব্যর্থতাকে বিদ্রূপ করা হয়েছিল, যে পুঁজিবাদী সমাজের উচ্চস্তরে ওঠার জন্য নানারকম ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করেও শেষকালে বুঝেছিল সত্যিকার বড় হওয়ার পথ ওটা নয় কেননা ওই তথাকথিত সামাজিক উচ্চস্তরটি ভণ্ডামি মাত্র। এ ছবিতে তিনি ফর্ম নিয়েও নানা ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করেছেন।

অনেকেই তখন ছবিটি দেখে মন্তব্য করেছিলেন 'ভিসুয়াল জাগলারি'। যত্রতত্র ফ্রিজ শটের ব্যবহার, ধারাভাষ্য ক্রশকাটিং ব্যাপারগুলো সাধারণ দর্শককে থমকে দিয়েছিল। সিনেমার পর্দায় অমন অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড বোধহয় তাঁরা প্রথম দেখলেন।

স্টেটসম্যান পত্রিকার সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রনাট্যকার আশিস বর্মণ ছবির 'টপিক্যালিটি' নিয়ে তর্ক শুরু করলেন। সত্যজি রায় চিঠি দিয়ে জানালেন : May I point out that topica lity of the theme in question stretches well bacl into antiquity, when it found expression i that touching fable about the poor deluded crov with a fatal weakness for status symbols…'

(Statesman—10.8.65

আগুনে ঘি পড়ল। জ্বলে উঠলেন মৃণাল সেন। চ্যাপলিনে ভবঘুরে চরিত্রটির প্রসঙ্গ তুলে তিনি লিখলেন—'....In this connec tion I am rather tempted to bring a champion ir this seemingly exciting polemics—Chaplin who much in the image of poor deluded crow o Aesop's fables expressed, to quote his own words 'my conception of the average man, of any man of myself.' His derby, according to him, strove for dignity, his moustache for vanity and so on, and in later years, after World War II (when the world was atrociously different), this age old fatal weakness for status symbols drove Chaplin to kill a dozen woman. And I am sure, Mr. Ray will not certainly doubt the topicality of Chaplin's theme brought out with such mastery during the long years of his film career (Statesman—15.8.65)

মধ্য কলকাতার কফি হাউস পাড়ায় তখন জমে উঠেছে আলোচনা। অনেকে বলছেন সত্যজিৎ রায়ের কি প্রয়োজন ছিল এই বিতর্কে নামার। মৃণাল সেনের দলের লোকরা ভাবছেন শুধু পত্রযুদ্ধেই সব ব্যাপারটার ফয়সালা হবে তো! নাকি আরও কিছু দূর গড়াবে?

সত্যজিৎ রায় ১৬ আগসট আবার এক দীর্ঘ চিঠি পাঠিয়ে তর্কের আঁচে ফুঁ ঝাড়লেন। তিনি বললেন—'....If "Akash Kusum" has any contemporaneity, it's on the surface—in its modish narrative devices, and in some lively details of city life. But where is the topicality in its theme, and where is it in the attitude of its makers ?... I wish Mr. Sen had not dragged Chaplin into this, although by doing so he has revealed that

his defence of his own film stems from a misunderstanding of the tramp character. The tramp knows only too well that he is not fooling anybody for any length of time with his derby and his moustache....The tramp, in fact, is not Aesop's foolish crow at all, but a wise crow who has learnt Aesop's lesson and yet wears the peacock's tail as a constant reminder of the inherent absurdity of status symbols. It is this worldly cynicism which makes the tramp—as well as it makes 'Verdoux'—a figure of our times.'

(Statesman—21.8.65)

বল তখনও মাঠে গড়াচ্ছে। পাঠক-দর্শকরা নীরব। সত্যজিৎ রায়, আশিস বর্মণ, মৃণাল সেনের কলম চলছে। প্রতিদিনকার স্টেটসম্যান পত্রিকার 'চিঠিপত্র' বিভাগটি তখন অবশ্যপাঠ্য। মৃণাল সেনের চিঠি সাতদিন বাদেই কাগজে বেরোল ঃ

....About Chaplin and his tramp—who are two separate personalities—I do not wish to be inventive like Mr. Ray and shall only quote the film-maker himself, 'This fellow', Chaplin says, 'is many-sided, a tramp, a gentleman, a poet, a dreamer, a lonely fellow, always hopeful of romance and adventure ...trying to meet the world bravely to put up a bluff, and he knows that too. And he is always buffeted by life—a fabulous consequence indeed ! Is he then a wise crow, aware of the inherent absurdity of status symbols ?'

(Statesman—28.8.65)

এর পরই এলো সত্যজিৎ রায়ের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী একটি চিঠি। তিনি 'আকাশ কুসুম' ছবির 'সাম্প্রতিক' চরিত্র নিয়ে মজা করে চিঠিটি লিখলেন। তাঁর প্রতিটি ছত্রে ছিল ব্যঙ্গের ছোঁয়া। চিঠির শেষ লাইনে তিনি লিখেছিলেন—' Contemporary moral A crow-film is a crow film is a crow-film.

(Statesman—1.9.65)

মৃণাল সেন পালটা জবাবে বললেন—' In trying to derive a 'contemporary moral' Mr Ray, by adding three doubtful prefixes, has conveniently reconstructed a famous line which originally belonged to the French film director Jean-Luc Godard : 'A film is a film is a film' In this connection it may be interesting to note that Mr. Godard, unlike Mr. Ray, prefers to remain amoral and will perhaps 'suffer' many human frailities including 'persistent lying' even 'in beds'.' (Statesman—13.1.65)

বিতর্ক হয়ত আরও চলত, পত্রিকার সম্পাদক আর চাইলেন না ঝড় তুলতে। বন্ধ হয়ে গেল চিঠিপত্র। বাংলা ছবির ইতিহাসে একটি ছবি নিয়ে এমন চিঠি-ঝগড়া বোধহয় সেই প্রথম। সেই-ই শেষ। এই চিঠি-ঝগড়াই মৃণাল সেনের 'আকাশ কুসুম'কে অবশ্য দর্শনীয় করে তুলল বুদ্ধিমান দর্শকদের কাছে। 'আকাশ কুসুম' মৃণাল সেনকে বাংলা ছবির দর্শকের কাছে একটি পরিচিত নাম করে তুলল।

এর প্রায় চার বছর বাদে এল 'ভুবন সোম' (৬৯), তাঁর প্রথম হিন্দি-ভাষী ছবি। প্রযোজকরা আগের ছবিগুলোর আর্থিক অসাফল্যে তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। পরিবেশক পাড়ায় তিনি অচ্ছুৎ। সুতরাং সরকারী সংস্থা ফিলম ফিনানস করপোরেশনের টাকায় তোলা হল 'ভুবন সোম'। ট্রানজিশন পিরিয়ডের শেষ ছবি এটি।

যাই হোক, 'ভুবন সোম' বাংলার ছবি জগতে শুধু নয় হিন্দি জগতেও নতুনত্বের এক দমকা হাওয়া নিয়ে এসেছিল। যদিও অসাধারণ সৃষ্টি হয়ে ওঠার কোন বিস্ময়কর বিশেষত্ব এ ছবির কাহিনী-অভিনয় বা ক্যামেরাওয়ার্কে নেই, সাম্প্রতিক সমস্যার খুব সামান্য ছায়াই পড়ছিল ছবির বক্তব্যে, কিন্তু এক অভিনব পদ্ধতিতে তিনি তৈরি করেছিলেন 'ভুবন সোম'কে। ক্যামেরা আর ঘটনাকে নিয়ে ছবি করেছেন তিনি। সাহিত্যের আঁচল ছিঁড়ে মৃণাল সেন চলচ্চিত্রের হাত ধরে এই ছবিতেই তিনি কলকাতার পরিচিতি হিসাবে হাজির করলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে। 'আকাশ কুসুম' ছবির পত্র-বিতণ্ডা ভুলে গিয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য মর্যাদা দিলেন। 'ভুবন সোম' মানুষের মুখোশ খোলার কাহিনী। মানুষ তার পরিবেশের হাতে পড়ে কিভাবে নিজের বহু ব্যবহারে রপ্ত মুখোশগুলো খুলে নিজেকে নিজে আবিষ্কার করে, এ ছবি তারই কাহিনী।

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় কোন মানুষের পক্ষে সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ থাকার চেষ্টা হাস্যকর। শেষ মুহূর্তে নেপথ্য ভাষণে জানানো হয়েছিল ভুবন সোমের চরিত্রে পরিবর্তন হওয়াতেই ঘুষখোর যাদব প্যাটেল চাকুরি খোওয়ানোর হাত থেকে রেহাই পেলো, কিন্তু তার মত অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে অভ্যস্ত জীবেরা একবার ক্ষমা পেলেও অপরাধ থেকে দূরে



সত্যজিৎ রায় এবং মৃণাল সেন—মুখোমুখি / এস রায়

থাকতে পারে না। অর্থাৎ ভুবন সোমের হৃদয় প্রতিটি মানুষেরই হৃদয় পরিবর্তন ঘটাবে—এটা মনে করা বাতুলতা মাত্র।

'আকাশ কুসম'-এ প্রয়োগ প্রকরণের যে পরীক্ষাগুলোকে 'ভিস্যুয়াল জাগলারি' বলা হয়েছিল এ ছবিতে সেগুলো বহুলাংশে শৈল্পিক সুষমায় ব্যবহৃত। ছবিটি কাব্যিক অনুভূতি জাগায়। চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষাকে তিনি একবারে অন্য রূপে বর্ণে হাজির করলেন ঐ ছবিতে।



আবার মৃণাল সেন মুখ ফিরিয়ে আনলেন কলকাতায়। নগর সভ্যতা নাগরিক সমস্যা তাঁকে বিব্রত করতে শুরু করল। অর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক জটিলতা মৃণাল সেনকে বোধ হয় অজান্তেই টেনে নিয়ে গেল তাঁর ছবি তৈরির 'যৌবন' পর্যায়ে। সত্তরের দশকের শুরুতে রাজনৈতিক মৃণাল সেনের জন্ম বলা যায়। ভারতের ছায়াছবির ম্যাপে তাঁর নামটি ফুটে উঠতে শুরু করল অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রম হিসাবে। সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠতে লাগলেন তিনি। তাঁর ছবিগুলো দর্শককে বিরক্ত করতে লাগল। আবেগের দোলনায় না চড়িয়ে মৃণাল সেন দর্শককে কারণ এবং ফলশ্রুতির দিকে চোখ ফেলতে বললেন। বললেন রি-অ্যাক্ট করতে। তখন তাঁর বিশ্বাসের ঘরে জমা হয়েছে ব্রেখটের সেই আদর্শ '…the work of art must grip the audience not through passive identification but through an appeal to reason which demands action and decision…'

'ইনটারভিউ' (৭০) ছবির শেষ দৃশ্যগুলো সে কথাই প্রমাণ করে মৃণাল সেন নিজেই বলেছেন—'আমরা তখন চলে গেছি একটা বিমূর্ত অবস্থায়। সেই অধ্যায়টির মত কোন কিছু আপনি-আমি ব্যবহারিক জীবনে করি না। সেখানে অন্ধকারে একজন বসে আছে। সমস্ত ব্যাপারটা একটা অ্যাবসট্রাকশন।…সে যখন সমস্ত কিছু ভাঙতে আরম্ভ করে তখন একটা concept এর স্তরে তার উত্তরণ ঘটে যায়। সেই মুহূর্তে সে একটা আইডিয়া, একটা কনসেপট।'

'ভুবন সোমের পর 'ইনটারভিউ'তে ঝাঁপ দেওয়া, বাস্তবকে ধরার নতুন চেষ্টা তাঁর প্রাণময়তারই প্রমাণ। এ ছবিকে সর্বস্তরে সফল বলা যাবে না, অন্তত বিন্যাসে। তবুও তিনি পরিবর্তনের কথা সোচ্চার হয়ে সেই প্রথম বললেন।—'আমরা বলতে চেয়েছিলাম যে আমাদের দেশে ট্রানসফার অফ পাওয়ার হয়েছে। কিন্তু সেই কলোনিয়াল লিগ্যাসি থেকেই গেছে…। সেই লিগ্যাসি সর্বস্তরে কাজ করে চলেছে। …'ইনটারভিউ' জামা কাপড়ের গল্প নিশ্চয়ই নয়, এ ছবিতে বলা হয়েছে পরিবর্তন প্রয়োজন সর্বস্তরেই—পলিটিক্যাল, সোস্যাল, ইকনমিক সর্ব স্তরেই…'।

ভারতে যথার্থ রাজনৈতিক সিনেমার জন্ম এই 'ইনটারভিউ' থেকেই। মৃণাল সেনের মতবাদের বিপরীত মেরুর লোকজনেরাও হৈ হৈ শুরু করে দিলেন বিপ্লবের অপব্যাখ্যা নিয়ে। আ-পলিটিক্যাল লোকজনরা ঝুনো নারকোল মনে করে তাঁকে কাকের মত দূরে সরিয়ে রাখলেও সত্তর দশকের জলন্ত রাজনীতি মৃণাল সেনকে নীরবে বসে থাকতে দিল না।

এ ছবির আর্থিক অসাফল্য তাঁকে নিয়ে গেল বিহারে। তুললেন 'এক আধুরি কাহানী' (৭১)। মোটেই শক্তিশালী ছবি নয়। বরং অনেক কাঁচা বলাই ভাল। স্বস্তি পেলেন না। ভেতরে ভেতরে চাপা ক্ষোভ জমছে তখন।

১৯৭২ সালে তৈরি হল 'কলকাতা ৭১'। আগুনে ঘি পড়ল আবার। কেউ কেই বললেন—'ক্রোধান্ধ নৈরাজ্য আর বিপ্লবী আবেগের পার্থক্যটা আদৌ স্পষ্ট নয় মৃণাল সেনের কাছে।' অপর দল বললেন —'মৃণাল সেনের শ্রেষ্ঠ ছবি।' ঝড় বইতে শুরু করল এলোপাথাড়ি। কলকাতা শহরে তখন বিপ্লবী রাজনীতির দারুণ দাপাদাপি। সমাজ পরিবর্তন করায় উৎসর্গীকৃত তাজা ফুসফুসগুলোকে বেয়নেট বিদ্ধ করতে অলিতে গলিতে চলছে কম্বিং অপারেশন। আতঙ্কিত প্রায় সবাই। রক্তাক্ত পরিবর্তনের আনন্দে কেউ কেউ উদ্বেল। ঠিক সেই সময়ই 'কলকাতা-৭১' এর কুড়ি বছরের ছেলেটা হাজার বছরের শোষণ বঞ্চনার ইতিহাসের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে বলে—'আমাকে কে গুলি করেছে আমি জানি, কিন্তু বলবনা।' আপনারা সাফার করুন যতদিন না আপনারা তাকে খুঁজে বার করতে পারেন।

এই ছবি মুক্তি পাবার পরই, একবারে সাধারণ মানুষরা যখন ছবিটাকে রিজেকট করল, তখন প্রশ্ন উঠল ফরম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর প্রকাশভঙ্গী জটিল হয়ে উঠছে নাতো! তিনি ছবি করছিলেন শোষিত বঞ্চিত দরিদ্র মানুষদের জন্য। তাঁদের মধ্যে সংগ্রামী চেতনাকে জাগিয়ে তোলার জন্যই তাঁর ক্যামেরাকে হাতিয়ার করা। অথচ ছবিগুলোর জটিল প্রকাশভঙ্গি ঐ সব মানুষগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখছে। মৃণাল সেন তখন বলেছিলেন—'একমাত্র পথ হচ্ছে আমি যেমন চেষ্টা করবো সাধারণ মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য হবার, তেমনি সাধারণ মানুষের একটা প্রচণ্ড দায়িত্ব আছে আমাকে বোঝার। দায়িত্ব শুধু যিনি ছবি করেন সেই শিল্পকর্মীরই নয়, দায়িত্ব দর্শকেরও যাঁদের জন্য ছবি করা।…'

মুখে বললেও তিনি সহজে বোধগম্য হয়ে উঠতে পারলেন না। তিনি সংগ্রামের কথা বললেন, বিপ্লবের শ্লোগান তুললেন, কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য হল কোথায় সেই ছবি! অথচ কি অবশ্যম্ভাবী কথা বলেছিলেন তিনি। 'আমরা বলতে চেয়েছি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের



'আকালের সন্ধানে' (নির্মীয়মান) / চিত্রজিৎ ঘোষ



আকালের সন্ধানে'র শুটিং-এ / চিত্রজিৎ ঘোষ

কথা এবং একথা বলতে গিয়ে আরো বলতে চেয়েছি যে এই লড়াই করতে গিয়ে আমরা যেন লেফট এস্টাবলিশমেনটের শিকার না হয়ে পড়ি।…সমস্ত রকম সংকীর্ণতা, সমস্ত রকম সেকটারিয়ানিজমের বিরুদ্ধে এই ছবি, বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমস্ত রকম সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে এই ছবি।' অথচ 'পদাতিক'(৭৩) তাঁর এই পর্যায়ের সেরা ছবি হয়েও সর্বজনগ্রাহ্য হল না। প্রয়োগভঙ্গিতে জটিলতা রয়েই গেল। দর্শকরা ভয়মেশানো শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করলেন।

মেজাজের দিক থেকে 'পদাতিক' এর বহু দৃশ্যে আমরা 'ভুবন সোম'-এর গীতিধর্মিতা খুঁজে পাই। 'আকাশ কুসুম' থেকে মৃণাল সেন চলচ্চিত্রের ভাষা খোঁজার যে নিরন্তর চেষ্টা করছিলেন 'পদাতিক'-এ তার আত্মস্থ পরিণতি। ছবির বিষয়কে তিনি ভেঙেছেন। ছবিকে প্রয়োজনে ডিড্রামাটাইজ করছেন। ফরমকে দুমড়ে কনটেনটের উপযোগী করে তুলেছেন। নায়ককে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবে আস্থাশীল করে তুলেছেন। সে কোন দলে যাবে সেটা বিষয় নয়, বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হল সেটাই ঘটনা। 'পদাতিক' এর এই পরিচ্ছন্ন সমাপ্তি রীতিমত সাহসের পরিচয়।

কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া কই? বইপড়া, লেখাপড়া জানা কিছু লোক উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করলেন, কেউ বা তুললেন কূটতর্কের ঝড়। আর আদতে যাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এইসব ছবি তৈরি তাঁরা রইলেন ভীতিপূর্ণ সম্মানজনক দূরত্বে।

পরের ছবি 'কোরাস'(৭৪)-এ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। যদিও মৃণাল সেন তখন বলেছিলেন—'কোরাস আমাদের ছবিতে শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ায় একটি ব্যাপক অর্থে—বিশাল মানুষের এক বিশাল ইচ্ছা—বিস্তর মানুষ, অনেক কথা, বহু লড়াই, সব যখন একীভূত হয়ে যায়, একটা বিরাট সাঙ্গীতিক মুহূর্ত সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ একটা কালেকটিভ আবেগ বা ইচ্ছা—তারই নাম 'কোরাস'।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা তখন অনেক পালটে গিয়েছিল। ১৯৫৫ সালের 'রাতভোর' ছবির বাস্তবতা তখন আর নেই। দ্বিতীয়ত মানুষ যে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে আছে—দুঃসহ হলেও তা মেনে নিচ্ছে অথবা বড়জোর ব্যক্তিগতভাবে লড়ছে—এটুকুই এতদিন বলা হয়েছে। কিন্তু মানুষকে যে সামগ্রিক হয়ে রাজনৈতিকভাবে লড়তে হবে, তার চারপাশের জগৎটাকে পালটাবার জন্যও কিছু করতে হবে—এসব কথা বাংলা ছবিতে মৃণাল সেনের আগে কেউ বলেননি। তিনি দুঃসাহসী নিশ্চয়ই। তাঁর এই সাহস প্রশংসনীয়।

আমরা জানি এইসব ছবি যাতে ব্যবসায়িক সফলতা না পায় একঘরে হয়ে যায়, সেজন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে নানাভাবে চাপ সৃষ্টির চেষ্টাও হয়ে থাকে, কিন্তু মৃণাল সেন সেই চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে এগিয়ে গেছেন। এগিয়ে গেছেন পারফেকশনের পথে। তিনি মানুষের কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করেছেন, আরও বেশি সহজবোধ্য হবার জন্য প্রয়োগ কৌশলের সরলীকরণ করেছেন।

এই পর্যায়ের এই নতুন পরিবর্তন শুরু হয়েছে 'মৃগয়া'(৭৫) ছবি থেকে। 'ওকা উরি কথা'(৭৬) (তেলুগু), 'পরশুরাম'(৭৮) এবং 'একদিন প্রতিদিন'(৮০)-এ সেই পরিবর্তনের পরিণতি বলতে পারি এই চারখানি ছবিতেই তিনি সহজ সরল প্রয়োগছন্দ বেছে নিয়েছেন। কনটেনটও সাবলীল। কোথাও হোঁচট খাবার সুযোগ নেই। জ্বলে ওঠা রাজনীতির কথা আছে সব ছবিগুলোতেই, কিন্তু সর্বত্রই সেই আবেদন এসেছে মানবিকতার স্তর থেকে, নাটকীয় ঘটনার পরিণতিতে এসেছে ঐ অন্তিম উপসংহার।

'পরশুরাম', ওকা উরি কথা' এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত মুক্তি পায়নি, কবে পাবে বলা সম্ভব নয়। পরিবেশক পাড়ার ষড়যন্ত্রেই এইসব ঘটছে একথা বলা বাহুল্য। তবে আনন্দের কথা মৃণাল সেন তাঁর জেদী প্রতিবাদী চরিত্র নিয়েও কমারশিয়াল প্রপোজিশন হয়ে উঠছেন। তাঁর সাম্প্রতিক ছবি 'একদিন প্রতিদিন' ভালো ব্যবসা করছে।' পুরুষশাসিত সমাজে নিম্নবিত্ত পরিবারের নগ্ন বাস্তব চিত্রটি এই ছবিতে উপস্থিত। 'পুনশ্চর' অন্য এক ছায়া যেন দেখা যায় এ ছবিতে। চলতি ভাষায় রাজনৈতিক কথাবার্তা একটিও নেই, অথচ সব ঘটনার তলায় তলায় বয়ে যাচ্ছে আজকের রাজনীতির চোরাস্রোত। যার বহিঃপ্রকাশ একমাত্র শেষ দৃশ্যের একটি সংলাপে—'লাথি মারি শালা অমন ভদ্দরলোকের মুখে।' এই সংলাপের মধ্যেই ক্ষোভ-জ্বালা-দুঃখ-বেরিয়ে আসতে না পারার যন্ত্রণা সব ফুটে বেরোয়।

যখন সত্যজিৎ রায় দেশ বিদেশে সম্মান অর্জন করছেন বছরের পর বছর, আশপাশে যখন একটা ছোট চারাগাছও দেখা যাচ্ছিল না, ঠিক

ভালো পাউডার মাগ্‌গী পড়ে
আর সস্তার পাউডার খুব বাজে হয়

কিন্তু
স্বস্তিক কাপড় ধোয়ার পাউডার
সবচেয়ে সেরা



২ কিলো,
১ কিলো,
৫০০ গ্রাম আর
২০০ গ্রামের
নতুন পলিপ্যাকে
পাবেন

কারণ এ হ'ল সাশ্রয়ের সঙ্গে উৎকৃষ্ট জিনিসের এক অপূর্ব মিলন।
অর্থাৎ যথেষ্ট সস্তা অথচ খুব ভালো।

নীল
স্বস্তিক
ডিটারজেণ্ট কাপড় ধোয়ার পাউডার

Shilpi-DM 24/80 Ben



মৃগয়া / সুভাষ নন্দী

'তখনই এসেছেন মৃণাল সেন নতুন রূপ নিয়ে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি আজ তাঁর হাতের মুঠোয়। তাঁর একাধিক ছবি, বিশেষ করে শেষের দিককার, বিদেশের আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে, সম্মান পেয়েছে পুরস্কার এনেছে।

আজকের কলকাতায় তাই সত্যজিতের পরই যে নামটি প্রথম মুখে আসে সেটি মৃণাল সেনের। শুধু কলকাতা বলি কেন, সারা ভারতেই বোধ হয় তিনি দ্বিতীয় নাম। তিনিই বোধ হয় একমাত্র পরিচালক যিনি ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাতেও ছবি করেছেন। তাঁর নিজস্ব স্পিরিটকে যথাযথ বজায় রেখেই তিনি ঐ সব ছবিতে হাত দিয়েছিলেন। এবং সত্যি কথা বলতে কি ওড়িয়াতে 'মাটির মনিষ' কিংবা তেলুগু ভাষায় 'ওকা উরি কথা' এক একটি মাইলস্টোন বলা যায়।

সারা ভারতের যে কোন অঞ্চলের তরুণ উদ্যমী পরিচালকদের কাছে মৃণাল সেন নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। বমবে-ব্যাঙ্গালোর-মাদ্রাজ-দিল্লি সব জায়গা'তেই দেখা গেছে তাঁকে ঘিরে তারুণ্যের জটলা।। উপরন্তু মৃণাল সেনের প্রধান গুণ তিনি ভালো বক্তা, যে কোন বিষয়ে যে কোন পারিবেশের সঙ্গে অ্যাডজাস্‌ট করে নিতে



'কোরাস' / সুভাষ নন্দী

পারেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাবার এক অসাধারণ দক্ষতা আছে তাঁর। এবং তাঁর বলার ভঙ্গিও খুব মনোহারী, দারুণ পারসুয়েসিভ। এখনও পর্যন্ত মৃণাল সেন তাঁর ছবি রিলিজ হলে ছবিঘরের সামনে সকাল-বিকেল-সন্ধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন। লোকমুখে দর্শকের রি-অ্যাকশন না শুনে তিনি নিজেই সরেজমিনে বেরিয়ে পড়েন। তাই তাঁকে কখনও দেখা যায় মেট্রো সিনেমার লবিতে একদল ছাত্রের সঙ্গে রাজনীতি-ছবি নিয়ে আলোচনা করছেন; কখনও বা এলিট সিনেমা হলের কাউনটারে দাঁড়িয়ে একজন প্রৌঢ় দর্শকের সঙ্গে জমিয়েছেন তর্ক। এমন ভাবে পাবলিক রিলেশনস বজায় রাখার কাজ কলকাতায় শুধু কেন, অন্য কোন পরিচালকও করেন কি না জানি না। এগুলো মৃণাল সেনের কপিরাইট।

একমাত্র তিনিই বোধ হয় তরুণদের উদ্দেশ্যে বলতে, পারেন— 'বেরিয়ে পড়ো পৃথিবীর পথে। এই ফিলম মাধ্যমে ও নিজের চেতনা- বুদ্ধিমত ছবি করে যাও এবং কখনও সুযোগ নিতে ছেড় না। এইভাবেই উন্নতি কর ও লড়াই চালাও। আমি চাই তোমাদের চলার পথ দুর্গম হোক।'

আশ্চর্যের ঘটনা হল—'পথের পাঁচালী'র পর এবং এখনও সত্যজিৎ রায়কে ঘিরে যেমন কোন আন্দোলন দানা বাঁধেনি, মৃণাল সেনকে ঘিরেও তেমন কিছু হল না। তিনি একলাই কাজ করে যাচ্ছেন। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকজন তরুণ হয়তো বা চেষ্টা করছেন, কিন্তু রাজনৈতিক 'বাদে'র চুলচেরা মতবিরোধ তাঁদের সবাইকে আলাদা করে রেখেছে। এটুকুই আশ্বাস যে 'নতুন' সিনেমার নতুনতর আন্দোলন যদিবা কিছু ঘটে থাকে তা এই মৃণাল সেনকে ঘিরেই। বমবের শ্যাম বেনিগল, কর্নাটকের সথ্যু, বি ভি করন্থ এবং আরও সবাই ছবি করছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে ঠিকই, কিন্তু আঁচড়ের টানে কোথায় যেন একই সুর এক-একবার বেজে ওঠে।

ভারতের ছবিকে সত্যজিৎ রায় দিয়েছেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আর মৃণাল সেন দিচ্ছেন প্রতিবাদী চরিত্র। শিল্পরসসমৃদ্ধ জীবনমুখী ছবির প্রবক্তা সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন সেই জীবনে জ্বালা আর দুঃখকে, হতাশা আর যন্ত্রণাকে, ক্ষোভ আর বিপ্লবী চেতনাকে জাগিয়ে তুলছেন।

লুই বুনুয়েল একবার বলেছিলে—Octavio Paz has said But a man in chains should shut his eyes, the world would explode. And I could say But that the white eyelid of screen reflects its proper light, the Universe would go up in flames.'

এখন ক্যামেরা তাঁর কাছে সংগ্রামের হাতিয়ার, যেমনটি ঘটেছে চিলিতে, আর্জেনটিনায়, ব্রাজিলে, বলিভিয়ায়, সেনিগালে, মেক্সিকোতে। শুনেছি এইসব দেশের বিপ্লবী চলচ্চিত্রকারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও মৃণাল সেনের। বিপ্লবী শিল্পসৃষ্টির মন্ত্রগুপ্তিটা হয়তো বা তাঁদের কাছ থেকেই মৃণাল সেনের পাওয়া। যারা সমাজ বদলের ঐতিহাসিক সত্যে বিশ্বাস করেন তারা চান তাঁর ঐ হাতিয়ার থেকে অল্প কিছুদিনের মধ্যে আগুনের গোলা বেরিয়ে আসুক। গনগনে বিধ্বংসী লেলিহান শিখায় অগ্নিপরীক্ষা হোক বাংলা ছবির, নেশাগ্রস্ত ভারতীয় ছবির। ★





'বাংলা ছবির সংকট এখন চরমে'

পরিবর্তন : গত কয়েক বছর ধরে 'বাংলা সিনেমা গেল গেল' রব উঠেছে। আপনিও কি মনে করেন বাংলা সিনেমা সত্যিই মৃত্যুপথযাত্রী? তার অবক্ষয়ের কারণ কী? তাকে কিভাবে আবার চাঙ্গা করে তোলা যায়?

সেন : যেদিন থেকে ছবিতে ঢুকেছি, বাংলা ছবির সংকটের কথা সেদিন থেকেই শুনে আসছি। সংকট কখনও বেড়েছে, কখনও কমেছে: কিন্তু সংকটমুক্তি কখনই ঘটেনি। দু'রকমের সংকট বরাবরই দেখা গেছে—অর্থনৈতিক, আদর্শগত। এই মুহূর্তে দুই সংকটই চরমে। বোমবাই ছবির দরুন বাংলার ছবি মার খাচ্ছে। আদর্শের সংকটও ভয়ংকর। একটা প্রচণ্ড ফাঁক দেখা যাচ্ছে। সেটা বেড়েই চলেছে। সমাধানের কোন সহজ পথ তো আমি দেখি না। চালিয়ে যাওয়া, টি'কে থাকা অবশ্যই একটা বড় কথা। অর্থনৈতিক সংকটের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে প্রথমেই দেখতে হবে আঞ্চলিক সীমানা ছাড়িয়ে কেমন করে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি রপ্ত করা যায়। বাংলা ছবি যাতে সারা ভারত দেখে তার দিকে নজর দিতে হবে। এবং আর এক ধাপ এগিয়ে বলতে হয়—কিভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে ছবিকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাও ভাবা দরকার। তাছাড়া আদর্শের লড়াই তো রয়েছেই—ছবি তৈরি করার ক্ষমতা, আধুনিক ছবি করার মানসিকতা, তার সরঞ্জাম জোগাড় করা, সামাজিক চেতনা জাগিয়ে তোলা, এইসব কাজগুলো মোটেই সহজ নয়।

পরিবর্তন : আপনার অধিকাংশ ছবিই ব্যবসায়িক দিক থেকে সফল হয়নি। এর কারণ কী? রাজনৈতিক আনডার-টোনই কি এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী?

সেন : কে বলেছে আমার অধিকাংশ ছবি ব্যবসায়িক দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে? এত বছর ধরে ছবি করছি, বোধহয় সর্বসাকুল্যে আঠারোখানা। অধিকাংশ ছবি যদি ব্যর্থই হতো, তাহলে ছবি করতে দিত কেউ? হয়ত, অসাফল্যের কথা আমি নিজের মুখেই বলেছি, কিন্তু সবটাই সত্যি বলেছি কি? তবে হ্যাঁ, লগ্নীকারকরা যে পরিমাণ টাকা ফেরৎ চান ছবি থেকে, সে পরিমাণ টাকা কোন ছবি থেকেই দিতে পারিনি। তবে অধিকাংশ ছবিতেই যে তাঁদের ডুবিয়েছি—একথাও ঠিক নয়।

তাছাড়া একটা সোজা কথা না বোঝার তো নয়। সিরিয়স ছবির বাজার কখনই কোথাও রমরমা হতে পারে না। হয়নি। সেদিক থেকে প্রযোজকরা আমাকে নিয়ে এবং আমার মতো আরও অনেককে নিয়ে তেমন খুশি নন। তবুতো চালিয়ে যাচ্ছি। আর এই মুহূর্তে যা দেখতে পাচ্ছি ছবি করার সুযোগ সুবিধে আগের চাইতে অনেক বেশি বেড়েছে, অন্তত আমার ক্ষেত্রে। কোন প্রযোজককে ছেড়ে কোন প্রযোজককে ধরব—এখন বাছাই-এর সুযোগও এসে গেছে। কারণ হয়ত ঐ যে আপনাকে প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলেছি—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমার ছবির কম-বেশি কাটতি হচ্ছে। বাংলা ছবি করেই তা সম্ভব হচ্ছে। চিরকাল লড়াই করে চলেছি, আজও করছি—আর্থিক সংকটের সঙ্গে, আদর্শের বা নীতির সপক্ষে।

পরিবর্তন : বাংলা তথা ভারতে রাজনৈতিক ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

সেন : রাজনৈতিক কথাটা না বলে সমাজ-সচেতন ছবির কথা বললে হয়ত আরও ব্যাপকতর স্তরে আপনার প্রশ্নটা নিয়ে যাওয়া যায়। যারা এই ধরনের ছবি সম্পর্কে উৎসাহী, তাদের কাছে ভবিষ্যৎ মোটেই নড়বড়ে নয়। বিশ্বাস, যুক্তি, বুদ্ধি, অনুভূতি—সব মিলিয়ে এক বিশেষ দায়বদ্ধতার প্রয়োজন। এবং যে কোন সৎ পরিচালকের পক্ষেই এ সবই আয়ত্তাধীনে রাখা সম্ভব বলে আমি মনে করি। বাংলা ছবির ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিচালকের আবির্ভাব কি আমরা দেখতে পাচ্ছি না?

পরিবর্তন : আপনার মতে বর্তমানে বাংলার শ্রেষ্ঠ পরিচালক কে? কোন গুণে তিনি শ্রেষ্ঠ?

সেন : এ প্রশ্ন আমাকে কেন আপনারাই বলুন না! আপনারা কি জানেন না?

পরিবর্তন : আমরা আপনার মতটা জানতে চাই।

সেন : একটা নামই তো বলতে হবে

পরিবর্তন : অনেকের মতে অযোগ্য **নতুন পরিচালকের** দল বাংলা ছবির মান ক্রমশ নামিয়ে দিচ্ছে। **তাঁরা বলছেন**—বর্তমান অবস্থায় কেবল যাদের যোগ্যতা **প্রমাণিত হয়েছে, সেইসব পরিচালকদেরই ছবি করা উচিত। আপনি কি সেই মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন?**

সেন : আমারও মত তাই। অযোগ্য পরিচালকের সংখ্যা এই কলকাতায় দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। যোগ্য পরিচালকরাও যে ছবি করার সুযোগ পাবেন—এমন সমাজ ব্যবস্থা আমাদের আছে কি? শুধু আকাশ কুসুম ভাবলেই চলবে না। আমাদের লড়াই তো যোগ্যতাকে লগ্নী-কারকদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া এবং এমনভাবে চাপিয়ে দেওয়া যাতে



আলোকচিত্র : চিত্তজিৎ ঘোষ

তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় থাকবে না, অন্তত ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে।

পরিবর্তন : আপনার মতে গত তিন বছরে তৈরি সেরা বাংলা ছবি কোনটি ? কেন সে সেরা ? সেই ছবিই কি অন্য ছবির মডেল হওয়া উচিত ?

সেন : কটা বাংলা ছবিই বা দেখেছি গত তিন বছরে ? সত্যি কথা বলতে কি, নিজের ছবি ছাড়া গত তিন বছরে খুব কমই বাংলা ছবি দেখেছি। এই অবস্থায় মত দেওয়া সমীচীন হবে না।

পরিবর্তন : মাঝে বেশ কয়েক বছর আপনি প্রায় বেকার বসেছিলেন। আপনি সরকারী সাহায্যের জন্য চেষ্টা করেছিলেন কি ? ফল কী হয়েছিল ?

সেন : বসে খুব বেশি থাকিনি। তবে এখন প্রতি বছরই একটা করে ছবি করি। যদিও সুযোগ পাই আরও বেশি ছবি করবার, আগে প্রথম যুগে দুটো ছবির ভেতরে ফাঁক থাকতো অনেক বেশি। কারণ ঐ একই—প্রযোজকেরা স্বাভাবিক কারণেই আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারতেন না। এখন অবশ্য সেই চেহারাটা পালটেছে বলে মনে হচ্ছে। তবে এ অবস্থা কতদিন থাকবে বলতে পারছি না। রাজ্য সরকারের কাছে ছবি করার প্রস্তাব আগে কখনও দিইনি, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরেও দিইনি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারই আমাকে ছবি করতে বলায় 'পরশুরাম' করেছিলাম এবং পরবর্তীকালে 'ওকা উরি কথা'র হিন্দি ডাবিং-এর জন্য কিছু টাকা ধার চেয়েছিলাম, পেয়েওছি।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছিলাম প্রথমে ১৯৬৮ সালে। এফ এফ সি সেই অর্থ জুগিয়েও ছিল। তার ফল আমার প্রথম হিন্দি ছবি 'ভুবন সোম'। সুদ সমেত টাকা শোধও করেছিলাম কিছুদিনের মধ্যেই। সেই অর্থ শোধ করার দাপটে এফ এফ সি-র কাছ থেকে আবার অর্থ সাহায্য পেয়েছিলাম 'পদাতিক' করবার জন্য। তার অনেকটাই এখনও শোধ করতে বাকি। সেজন্য মাঝে মধ্যেই সরকারী নোটিশ আসে তাগাদা দিয়ে। তাছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকেও একবার টাকা ধার করেছিলাম 'কোরাস' ছবির জন্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা পুরস্কার পেয়েও ছবিটি অর্থপ্রাপ্তির দিক থেকে অসার্থক।

পরিবর্তন : আদর্শগতভাবে সমপন্থী হয়েও বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে আপনি বিরূপ সমালোচনা করেন কেন ? আপনি কি মনে করেন যে এই সরকার বাংলা চলচ্চিত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ করছেন ?

সেন : প্রমোদকর নিয়েই এবং প্রমোদকরের ওপর বাড়তি কর নিয়ে আমি সম্প্রতি বামফ্রন্ট সরকারকে আক্রমণ করেছি। এটা আমার ব্যক্তিগত মত। আর্থিক বণ্টনের সুষম ব্যবস্থার কথা মনে রেখেই আমি এই প্রশ্ন তুলেছিলাম এবং সরকারকে আক্রমণ করেছিলাম। এই আক্রমণ শুধু সরকারের বিরুদ্ধেই ছিল না, পরিবেশক প্রদর্শকের বিরুদ্ধেও। এতে বামপন্থায় সমধর্মী হয়েও এই আক্রমণের অধিকার আমার অবশ্যই আছে। আমার রাজনৈতিক আদর্শে চিড় খাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এই সরকার অত্যন্ত সততার সঙ্গে বাংলা ছবির সমস্যার মোকাবিলা করছেন। কিন্তু সব সময়ই যে সরকার সমস্যার সমাধানের জন্য বাস্তবমুখী চিন্তা ভাবনা করছেন এমন কথা জোর করে বলব না। কোন কোন ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে সরকারের বিরোধিতা হয়েছে। হচ্ছে এবং হবে। তাতে করে সরকারের সততা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলার কারণ দেখি না।

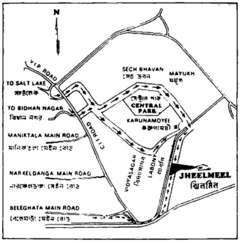
পরিবর্তন : ফিলম সোসাইটি কিংবা ফিলম ক্লাবগুলি সুস্থ দর্শক গড়তে পেরেছে কি ? তাতে বাংলা চলচ্চিত্রের কী লাভ হয়েছে ?

সেন : পরিবেশ তৈরি অবশ্যই করতে পেরেছে এবং তাতে সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রের অনেক উন্নতিই হয়েছে বলব। শুধু বাংলা কেন ?

পরিবর্তন : সেনসরশিপ কি তুলে দেওয়া উচিত ?

সেন : বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একবারেই না। কিন্তু, এই ব্যবস্থার নানা পরিবর্তন-পরিমার্জন প্রয়োজন। ★





ছোটদের জন্য তৈরী হয়েছে "ঝিলমিল" সকলের চিত্তবিনোদনের বিশেষ করে শিশুদের উন্মুক্ত মাঠে ঘুরে বেড়াবার, পিকনিক করবার এবং সময় কাটাবার নতুন ব্যবস্থা।

এখানে থাকছে টয়ট্রেন, থাকছে লেক, থাকছে পাহাড়, থাকছে সর্পোদ্যান আর পাখীর খাঁচা, হরিণের আস্তানা, গাছগাছড়া

"ঝিলমিল" সোম এবং শুক্র বাদে রোজ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্য্যন্ত খোলা থাকবে। তিন বছর পর্য্যন্ত শিশুদের ঢুকতে বা টয়ট্রেন চাপতে এবং সর্পোদ্যান দেখতে কোন পয়সা লাগবে না। অন্যদের লাগবে।

বৃহত্তর কলকাতার জনসাধারণের জন্য সি. এম. ডি. এ-র এই নবতম অবদান "ঝিলমিল" একবার ঘুরে আসুন। বাচ্চাদের নিয়ে।

তারপর আমাদের কাছে লিখুন ঝিলমিল সম্পর্কে। হয়তো বা সি. এম. ডি. এ সম্বন্ধে নতুন ভাবে চিন্তা করবার অবকাশ পাবেন। ছোটরাও ঘুরে এসে আমাদের কাছে চিঠি লিখো।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম. ডি. ৩৯, আকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০১৭ থেকে প্রচারিত)



'এক সোম জীবন বাঁচিয়েছে, আর এক সোম করেছে জনপ্রিয়'

ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ 'দুধারা' ছবি করতে এসে। ছবিটা ফ্লপ করলেও আমাদের পরিচয়টা ফ্লপ করেনি।' 'দুধারা' ছবির নায়িকা গীতা সোমই এখন মৃণাল সেনের স্ত্রী গীতা সেন।

পরিচয় হয়েছিল চুয়াল্লিশ সালে। বিয়ে হয়েছে বাহান্ন সালের ১০ মারচ। মৃণাল সেনের বাড়ির সবাই-ই ওঁদের প্রেমের ব্যাপারটা জানতেন। গীতা সোমের বাড়িতেও অজানা ছিল না। সুতরাং কোন অসুবিধেই হয়নি।

দু'পক্ষের বাড়িতেই ছিল রাজনীতির হাওয়া। প্রগতিশীল রাজনীতি। আর সর্বক্ষণের প্র.য় আজন্ম সঙ্গী ছিল দারিদ্র। গীতা সোমের বাবা স্বদেশী করতেন। হুট-হাট জেলে চলে যাওয়া ছিল জলভাত। চরম গরিবীর সঙ্গে লড়াই করেও তরুণী গীতা নাচ-গান শিখেছিলেন। সংসারের ভারি জোয়ালটা তাঁর কাঁধে প্রায়ই এসে পড়তো।

অভিনয় করা অনেকটা সেই কারণেই। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য হুগলীর ভদ্রকালী থেকে এসে টালিগঞ্জ এবং বরানগরের স্টুডিওয় কম পরিশ্রম করতে হয়নি তাঁকে। একদিন ঘটল অঘটন। 'ভৈরবমন্ত্র' নামে একটি ছবিতে নায়িকার চরিত্র করছেন গীতা সোম। কয়েকদিন কাজ হয়েছে। 'বিশেষ' কয়েকটি দৃশ্যে 'অভিনয়' করার জন্য পরিচালকের কাছ থেকে প্রস্তাব এল। নায়িকার সেকস অ্যাপিলকে তিনি ছবিতে কাজে লাগাবেন। সেইদিনের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে আজকের গীতা সেন বললেন…'পরিচালক মশাই-এর চোখে শুটিং-এর দিন আমি অন্য উদ্দেশ্যের ঝলকানি দেখেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিলাম। ও ছবিতে আর কাজ করিনি। পরিচালক প্রযোজকরা পরে আমাদের বাড়িতে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে যান।'

ছবিতে সেই শেষ কাজ। তার আগে ঋত্বিক ঘটকের 'নাগরিক' ছবির কাজ শেষ করেছিলেন। সুতরাং নিত্যসঙ্গী দারিদ্র সঙ্গ ছাড়ল না। কাকারা একসময় চেয়েছিলেন গরলগাছার এক দোজবরের সঙ্গে গীতার বিয়ে দিয়ে 'দায়' মেটাতে। পারেননি।

মৃণাল সেনের সঙ্গে বিয়ে হয়েও অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। কনফারমড বেকার তিনি। ছবি করার চেষ্টা করছেন। অশ্বিনী দত্ত রোডে বাসা ভাড়া নিয়ে দুজনে থাকেন। কোন দিন খাবারই জোটে না। স্টোভে শুধু জল ফুটে যায়, শূন্য হাতে দিনান্তে বাড়ি ফেরেন মৃণালবাবু।

এই অবস্থাটা কম দিন চলেনি তাঁদের। দশ বারো বছরতো বটেই। ছেলেকে খাবার দিতে পারেননি। ফুড কেনার পয়সা ছিল না।

কিন্তু আপোষ কখনও নয়। গীতা সেনের স্বামীকে নিয়ে গর্ব এজন্যই। দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করেছেন দুজনে। 'নামী-দামী শিল্পীদের নিয়ে কাজ করার অফার বহুবার এসেছিল ওঁর কাছে। আমরাই তাঁদের প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছি। অথচ সেসব প্রপোজাল গ্রহণ করলে আজ আর ভাড়া বাড়িতে থাকতে হতো না আমাদের।'—বলার



'একদিন প্রতিদিন'-এ মৃণালের সহধর্মিণী গীতা সেন / সুভাষ নন্দী

সুরে গর্বের আনন্দ।

'ভুবন সোম' ছবির সাফল্যের পর একদিন গীতা সেন তাই স্বামীকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন—'এক সোম তোমার জীবন বাঁচিয়েছে আর এক সোম তোমায় জনপ্রিয় করল।'

ঘরোয়া মৃণাল সেন মানুষটা কেমন জানতে চাইলে তিনি বললেন—'দারুণ ফুর্তিবাজ। খোলামেলা। একদম রাগ নেই। ঘর ছেড়ে একদম বেরোতে চান না। কাজ না থাকলে দিনের পর দিন এই ঘরেই বসে থাকেন।' ছেলে কুণাল তাঁর মনের সঙ্গী। আড্ডারও।

দারিদ্র আর অভাবকে পরিবারের সবাই গায়ের পোশাক করে নিয়েছেন। বিলাসিতা, বড়লোকিপনা একদম সয় না। 'যেদিন প্রথম ফ্রিজ এলো বাড়িতে, কাউকে ঠাণ্ডা জল দিতে লজ্জা পেয়েছি। এমনকি নিজেদের খেতেও অস্বস্তি হয়েছে।' বললেন গীতা।

এখনও ছেলে কুণাল বা ছেলের বৌ নিশা পড়াশুনো করতে যায় বাসে চড়ে। গাড়ি কথখনো না। কুণাল যায় এল-নাইন বাসে বি টি রোডের আই এস আইতে, নিশা যাদবপুরে। ওঁরাই বলে—'গাড়িতে কেন যাবো?'

ছবি তৈরির পেছনে আদর্শ স্ত্রী হিসাবে তাঁর ভূমিকা কি জানতে চাইলে গীতা বললেন—'ছবিটা সম্পূর্ণভাবে ও'রই সৃষ্টি', সেখানে প্রত্যক্ষ কোন হাত নেই আমার। আমাকে যখনই যেভাবে সাহায্য করতে বলেছেন, করেছি। ও'র চারটি ছবিতে অভিনয় করেছি। আর নিজের সুখের জন্য আপোষ করতে কখনও না বলিনি। বলবও না।'

গীতা সেন সেই অর্থে শুধু আদর্শ স্ত্রীই নন, সত্যিকারের অর্ধাঙ্গিনী। স্বামীর সাফল্যে আজ তিনি আনন্দিত, কিন্তু বিহ্বল নন। ফেলে আসা দুঃখের দিনগুলো সব সময়ই তাঁকে জীবনের এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। আজকের সাফল্য ও সাচ্ছল্য তাই তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দেয়নি। স্বামীর ছায়া হয়ে চীন, রাশিয়া, ইউরোপের নানা উৎসব নানা পরিবেশে ঘুরলেও ভদ্রকালীর গীতা সোম পঞ্চাশ বছর পার করেও একটুও বদলাননি। পদবী বদলে শুধু গীতা সেন হয়েছেন। মানুষটা রয়েছেন একই রকম।

ঘুমন্ত ছেলেকে ফেলে আত্মঘাতী হবার চিন্তায় কাটানো সময়টা পেরিয়ে এসেও গীতা সেন হয়ত এখনও ভাবেন পরিস্থিতি উলটে যেতে কতক্ষণ? ভারতের সবচাইতে বিতর্কিত পরিচালকের স্ত্রী হবার সৌভাগ্য যতটা ঝুঁকিটাও কম নয়। তাই তিনি স্থিতধী, স্থিরচিত্ত। আগেকার সেই সংগ্রামী গীতা সোমই। ★



'ভুবন সোম'

সাক্ষাৎকার : নির্মল ধর



দেখুন...
সবচেয়ে সাদা
করার জন্য
রানীপাল®

কাপড় শেষবার ধোবার আগে জলে একটু রানীপাল মেশান আর এবার দেখুন কাপড়ের ঝকঝকে সাদা! রানীপালের সাদা! সাদা কাপড় সে যাই হোক না কেন সুতী, সিন্থেটিক আর ব্লেণ্ডেড - রানীপাল ব্যবহারে ঝকঝকে হয়ে উঠবেই।

নিয়মিত রানীপাল লাগান…
আর সাদা কাকে বলে দেখুন ও দেখান



সুতীর কাপড়ের জন্য **রানীপাল**®
সিন্থেটিক ও ব্লেণ্ডেড কাপড়ের জন্য
রানীপাল® -এস

Shilpi SG-2A/78 Ben



তিন সমকালীন পরিচালকের চোখে

পরিবর্তনের পক্ষ থেকে তিন সমকালীন পরিচালক—সত্যজিৎ রায়, তরুণ মজুমদার এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কাছে মৃণাল সেন সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। প্রশ্নগুলি মোটামুটি ছিল : আপনি কি মৃণাল সেনকে বাংলা ছবিতে রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রবর্তক বলে মনে করেন? বাংলা ছবির ক্ষেত্রে মৃণালের ছবিগুলির গুরুত্ব কতটা? মৃণাল কোন কোন কারণে বাংলা ছবির অন্যতম dominating factor? তাঁর ছবির সাফল্য-অসাফল্য আপনাকে কি ভাবে প্রভাবিত করে? রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকার হিসাবে মৃণাল এগিয়ে যাচ্ছেন, না পিছিয়ে? বিদেশে তাঁর মূল্যায়ন কিভাবে হচ্ছে?



কিছু বলব না—সত্যজিৎ রায়

কনটেমপোরারি জীবিত কোন পরিচালক সম্পর্কে কোন মন্তব্য আমি করতে চাই না। বিদেশেও খুব কম পরিচালকই এমনটি করেন। উপরন্তু আমরা এত ক্লোজলি কাজ করছি! ছোট্ট বাজার; ঘরোয়া পরিবেশ। দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া সম্পর্কে কিছু জানতে চান, বলতে পারি।

ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভাবে বাংলা ছবিতে সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার ছাপ আগেও ছিল। যেমন, ডি. জির 'বিলেত ফেরৎ' বা নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' ছবি দুটি। এই প্রসঙ্গেই আসে বাস্তবতাকে অসামান্য তাৎপর্যময় ও শিল্পসম্মতভাবে চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারটি, যার শুরু 'পথের পাঁচালী' দিয়ে। সত্যজিৎ রায়ের অনেক ছবি এরপর বারবার তুলনারহিত ভাবে শিল্প-সম্মত হয়ে ওঠার পরেও আমাদের প্রথম চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সচেতনভাবে নাড়া দেয় ভারতীয় সামাজিক-বাস্তবতার দিকটি সম্পর্কে। ইদানীং বারবার মনে হয় সত্যজিৎ রায়-এর চলচ্চিত্রের এই দিকটি নিয়ে আরো ব্যাপক ও বিশদ আলোচনা হওয়া উচিত। তাঁর অপু-সিরিজ, পরশ পাথর, জলসাঘর, দেবী, কাঞ্চনজঙ্ঘা মহানগর, প্রতিদ্বন্দ্বী, জন-অরণ্য ভারতীয় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিকগুলির বিভিন্ন স্তর-বিন্যাস ও শ্রেণীদ্বন্দ্বকে যে অসম্ভব দক্ষতায় ও অসামান্য শিল্পসম্মতভাবে তুলে ধরে—ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তা সত্যিই বিরল।

ঋত্বিক ঘটকও অসম্ভব দক্ষতা দেখিয়েছিলেন ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পালাবদলের বিভিন্ন স্তরকে তাঁর 'মেঘে ঢাকা তারা' ও পরবর্তী ছবিগুলির মাধ্যমে তুলে ধরে। তবে, একটি বিশেষ কালকে ধরে পর্যায়নুক্রমিক ভাবে একের পর এক ছবিতে ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিকটিকে তুলে ধরার চেষ্টার দৃষ্টান্তটি সত্যিই একমাত্র মৃণাল সেনের ছবির মধ্যেই দেখা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতি ও তার ওপর নির্ভরশীল সামাজিক মূল্যবোধ যে ব্যাপক ঝাপটা খেয়েছিল সেই যুদ্ধকালীন অর্থনীতি ও মেশিন-নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা এবং যে ভয়াবহ বিপজ্জনক গর্তে ঠেলে দিয়েছিল ভারতীয় অর্থনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে তা আজো টের পাই যখন 'বাইশে শ্রাবণ' দেখি, যা মৃণাল সেন তৈরি করেছিলেন ১৯৬০-এর গোড়ার দিকে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত, 'প্রতিনিধি' ও 'ভুবন সোম' বাদ দিলে, তার নিজের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ছাপ নেই এমন ছবির কথা মনে পড়ে না।

হাবা-বোবা বাংলা ছবি যে ব্যাপক শিল্পহীনতা ও বুদ্ধিহীনতায় ভুগছে শুধুমাত্র ব্যবসায়িক হয়ে ওঠার ব্যর্থ মরণপণ চেষ্টায়, সেখানে সত্যজিৎ রায় বা ঋত্বিক ঘটকের মতো মৃণাল সেনও যে বিশিষ্ট ব্যতিক্রম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা যে তিনিও পালন করেছেন সে কথা বলা তো বাহুল্য। তাছাড়া যে নিজস্ব ধারায় তিনি ছবির 'নির্মাণ'-এর কাজটিকে সমাপ্ত করেন—অল্প টাকা ও অত্যল্প শুটিং-এ—তা অনেক তরুণ ভারতীয় পরিচালককেই এক সময় প্রভাবিত করেছিল। অনেক টাকায় ছবি করিয়েদের ভিড়ে মাথা ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি বা ঐ ভাবে মাথা ঢুকিয়ে টিকে থাকার ব্যাপারটিতে যে রণ-কৌশল আছে তা শিখে নিতে সাহায্য করেছিল অনেক তরুণ পরিচালককে। এ দলে আছেন মণি কাউল, কুমার সাহানি, শ্যাম বেনেগেল, গিরিশ কাসারাভাল্লি, আদুর গোপালকৃষ্ণ প্রভৃতি। ঐ একই রকম ভাবে মাথা ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি প্রভাবিত করেছিল আমাকেও।



'তরুণ পরিচালকদের উপর মৃণালের প্রভাব অনেক'—বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

সব সময়ই একজন সচেতন চিত্রপরিচালককে নানান সফলতা ও অসাফল্যের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। মৃণাল সেনও তার ব্যতিক্রম নন। এই এগিয়ে যাওয়ার পথটুকু চলতে চলতে সেই পরিচালক যে ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যে দিয়ে নিজেকে শুধরে নেওয়ার কাজটুকু করে যান, কখনো কখনো তা সত্যিই প্রভাবিত করে সমসাময়িক ও পরবর্তী চিত্র-পরিচালকদের, অন্তত স্পষ্টত হোক বা ইশারায় হোক তাদের সংকেত পাঠায় বেশ খানিকটা শিখে নিতে। মৃণাল সেনের 'কলকাতা ৭১'-এর তড়িৎ-সাফল্য শেখায় সঠিকভাবে সমসাময়িক সময়কে নিয়ে করা ছবি সেই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিকগুলোকে দেশের দর্শকগ্রাহ্য বুদ্ধিচর্চার মতন করে তুলে ধরলে দর্শক কতখানি পাশে এসে দাঁড়ান এবং পরিচালকের মনোবলকে কতখানি বাড়িয়ে দেন। আবার তাঁর 'কোরাস' ছবিতে সেই দর্শককেই যখন সাততাড়াতাড়ি তাঁর পাশ

থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে উঠে পড়তে দেখি তখন থমকে যেতে হয়। বোঝা যায়, ছবি-তৈরির আগে বা ছবি তৈরির সময় যে বিশেষ দর্শকের কথা ভেবে একটি বিশেষ ছবি তৈরি করা হয়, সেই দর্শকদের মানসিক ভাবনা-চিন্তা ও তার গতিকে কতখানি প্রশ্রয় দিয়ে ছবি তৈরির কাজটি সমাধা করা উচিত। ঘাট ও পারের সীমানা হারিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে গল্প-ভালবাসা বাঙালি দর্শকের থমথমে মুখ দেখতে চাই না আমিও। তাছাড়া, মৃণাল সেন যে সুন্দর ও শিল্পসম্মতভাবে 'গল্প' বলতে পারেন তার প্রমাণ একাধিকবার দেখিয়েছেন তিনি। তাঁর এ পর্যন্ত শেষ ছবি 'একদিন প্রতিদিন' থেকে পিছিয়ে গিয়ে এমন কি তাঁর নিজেরও খুব প্রিয় নয় ছবি 'নীল আকাশের নীচে' পর্যন্ত বারবার এ বিষয়টিতে তাঁর অবাধ দক্ষতা ফুটে ওঠে।—এই সব এবং আরো অনেক কিছু ছবি করার সময় আমাকে ভয়ে কাঠ করে দেয় মাঝে মাঝে, ভাবি—আমার দর্শকেরা কথা ভুলে যাচ্ছি না তো?

মৃণাল নিজেও বোধহয় নিজেকে 'বিপ্লবী রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকার বলে মনে করেন না। ১৯৪৭ ও তার পরবর্তী সময়ে পুড়ে পাওয়া স্বাধীনতার কথা অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে। মনে আছে ১৯৬৮-১৯৭৩ এর সময়গুলো। কিন্তু 'বিপ্লব'? হয়েছে নাকি আমাদের দেশে? একটি দেশের রাজনৈতিক বিপ্লবই চলচ্চিত্রকারের জন্ম দেয়। আরজেনটিনিয়ার বিপ্লবী রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক নয়। তাই আরজেনটিনিয়ায় যে ভাবে বিপ্লবী রাজনৈতিক পারটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিপ্লবী রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকারের জন্ম হয়, এদেশে তা সম্ভব নয়। এদেশে এখন একজন সামাজিকভাবে সচেতন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী চিত্রপরিচালকের পক্ষে এই পরিস্থিতি অনুযায়ী যা করা সম্ভব তা হলো—তার চারপাশের শেকড় গেড়ে বসে থাকা বিবুদ্ধ-ব্যবস্থার মূল্যায়ন ও তার মাঝখানে তার নিজের শ্রেণীর দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা (যার অসাধারণ নিদর্শন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'মহানগর' ছবি দুটি), এ ছাড়া ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা' মৃণাল সেনের 'একদিন প্রতিদিন' ও আরো কয়েকটি ছবি। সেই ব্যবস্থার কলকাঠি যারা নাড়ে বা নড়ে ওঠে বিভিন্ন হাত পরম্পরায় সেই কলকাঠিকে চিনিয়ে দেওয়া ও তার নিয়মকানুনগুলোর পারস্পরিক বিরোধিতাকে চিহ্নিত করা এবং চিত্রপরিচালকের ওপরের ও নীচের শ্রেণী সম্পর্কে তার ভাবনা-চিন্তাকে চলচ্চিত্রায়িত করা—যার কোনটাই রাজনৈতিক ভাবে বৈপ্লবিক কাজ নয়। ফলে, কোন বিপ্লবের পথ বাতলে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া বা তা না দিতে পারার জন্য পিছিয়ে পড়া মৃণাল সেনের পক্ষে সম্ভব নয়। আপাতত, ঐ সামাজিক' সচেতনতা বাহৃত হয়েছে কি হয়নি এই প্রশ্নেই একজন চিত্রপরিচালকের এগিয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে পড়া নিয়ে ভাবা যেতে পারে। সেই অর্থে মৃণাল সেন নিশ্চয় পিছিয়ে যাননি, অন্তত আমার তো তাই মনে হয়।

বিদেশী চলচ্চিত্র দর্শক-সমালোচকদের মধ্যে যে ভারতীয় চিত্রপরিচালকের নাম সবচেয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতে শুনেছি বারবার তিনি অবশ্যই সত্যজিৎ রায় এবং সত্যজিৎ রায় এবং সত্যজিৎ রায়। এই জনপ্রিয়তার রকমফের আছে—ইংলনডে সত্যজিৎ রায় যে ভাবে জনপ্রিয়, ফ্রানসে সে ভাবে নন। আবার তাঁর সম্পর্কে প্রচণ্ড শ্রদ্ধাশীল দর্শক-সমালোচকদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে যারা তাঁর সব ছবি সম্পর্কে সমান আগ্রহী নন। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম গত বছর লোকার্নোতে। 'দূরত্ব' ঐ উৎসবের মূল শাখায় থাকায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম ওখানে। Plants are Watching নামে একটি আমেরিকার ছবির পরিচালকের (এ ছবিটিও মূল উৎসবে ছিল, পরিচালকের নাম মনে নেই) সঙ্গে কথায় কথায় জানা গেল তিনি এ পর্যন্ত একটিও 'রে-ফিলম' দেখেননি—কফি আটকে গিয়ে থেকে গিয়েছিল গলায় অনেকক্ষণ! ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে, খুব ভালো লাগে, ইদানীং বিদেশে আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। সামনের বছর ৮১তে লোকার্নো চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর প্রায় সমস্ত ছবি নিয়ে একটি Retrospective-এর আয়োজন করা হয়েছে। মৃণাল সেনও যথেষ্ট আলোচিত একটি নাম। হাল সময়ের তরুণ ভারতীয় কয়েকজন চিত্রপরিচালকদের কাজ সম্পর্কে বিদেশে নানান জায়গায় যথেষ্ট আগ্রহ ও শ্রদ্ধা লক্ষ্য করেছি—অনেকেই বেশ খানিকটা খোঁজ-খবর রাখেন সাম্প্রতিক সময়ের কয়েকজন চিত্রপরিচালক সম্পর্কে।



একজন পরিচালকের কাজের মূল্যায়ন করা যায় দু'ভাবে। এক—তিনি কত পুরস্কার পেয়েছেন তার নিরিখে, দুই—পরিচালকের চিন্তা সাধারণ মানুষের চিন্তাকে কতখানি প্রভাবিত করছে তার ভিত্তিতে। ব্যক্তিগতভাবে আমি পুরস্কারের সংখ্যা দিয়ে কারও কাজের মূল্যায়ন করতে রাজি নই। কারণ বিভিন্ন পুরস্কার কমিটির ভেতর বাইরের অনেক অজানা তথ্য আমার জানা। কেন-কাকে কিভাবে অনেক সময় পুরস্কার দেওয়া হয় বা পাইয়ে দেওয়া হয় সেটা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই জানি। পুরস্কারের প্রতি তাই আমার আস্থা কম।

তুলনায় দ্বিতীয় উপায়টা আমার কাছে অনেক ভ্যালিড মনে হয়। একজন পরিচালক তাঁর আশপাশের মানুষকে কিভাবে নিজের কাজের সঙ্গে কাজের মধ্যে জড়িয়ে নিচ্ছেন সেটা লক্ষ্য করার বিষয়। সেদিক থেকে মৃণাল সেনের ছবির সঠিক মূল্যায়ন বোধ হয় এখুনি সম্ভব নয়। এটা সত্যি যে কলকাতা শহরে বিশেষ করে একদল শিক্ষিত বুদ্ধিমান দর্শকের মধ্যে তাঁর একটা নিজস্ব গোষ্ঠি তৈরি হয়েছে। কিন্তু যে কোন পরিচালকই ছবি করেন ম্যাস অফ দি পিপল-এর কাছে পৌছনোর জন্য। মৃণাল সেন তো করেনই। কিন্তু অনেক সময়ই তাঁর ছবি সেই 'দূরের কাছের' মানুষগুলোর কাছে পৌঁছয় না। এরজন্য অবশ্য অনেকটাই দায়ী আমাদের ফিলম ইনডাসট্রির ইনফ্রাস্ট্রাকচার। নইলে সরকারী পয়সায় তৈরি 'পরশুরাম' এখনও মুক্তি পায় না! সরকার ভাবেন ফিলম পাবলিসিটির মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে বিনি পয়সায় ষোল মি মি-এ ছবিটা দেখাবেন!

অর্থাৎ প্রকারান্তরে আরও একটা সত্য বেরিয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের জন্য ছবি করেও তাঁদের কাছে তিনি পৌঁছতে পারছেন না। কেন?—এটা ভাববার মত প্রশ্ন বটে।

বাংলা ছবিতে সচেতন সামাজিক চিন্তার ছাপ বহুদিন আগে থেকেই আমরা দেখছি, 'চণ্ডীদাস' থেকেই। সত্যজিৎ রায়ের ছবি সমাজ সচেতন, রাজনীতি সচেতন নয় কি? তবে মৃণাল সেনের বৈশিষ্ট হচ্ছে তিনি একের পর এক রাজনৈতিক ছবি করে দর্শকের মধ্যে সচেতন চিন্তাধারা জেনারেট করেছেন। এটাই বুঝি তাঁর সাফল্য।

কয়েকজন তরুণ পরিচালক অবশ্যই ইনসপায়ারড হয়েছেন মৃণালের কাজ দেখে—এটা অস্বীকার করা যাবে না। তাঁর এই চেষ্টার মূল্য আছে বই কি!

ছবি কম্যুনিকেটিভ মিডিয়ম। ওঁর ছবি দেখে এটুকু অন্তত শিখতে পারি যে দর্শকরা কী জিনিস গ্রহণ করতে পারে না। 'ডোনটস'গুলো শিখি, কিভাবে করব, কি ভাষায় বলব যাতে অনেক বেশি দর্শক আমার ছবির প্রতি আকৃষ্ট হয়।

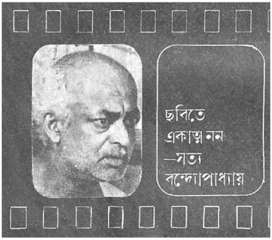
মৃণাল সেন এগুচ্ছেন না পিছোচ্ছেন—এ প্রশ্নের জবাব দর্শকরাই ভাল দিতে পারবেন। বিদেশে আমি কম গেছি; সুতরাং সেখানে মৃণালের মূল্যায়ন সম্পর্কে জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।



তিন অভিনেতা-অভিনেত্রীর চোখে

মৃণালবাবু যাঁদের জন্য, যাঁদের নিয়ে ছবি করেন, ছবি করার ভঙ্গিতে সেটা যেন থাকে না। তাঁদের স্তরে গিয়ে ছবি করতে না পারলে কম্যুনিকেট করবেন কিভাবে?

প্রবীণ অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মৃণাল সেনের ছবি তৈরিতে এটাই প্রধান খামতি। তাঁর আরও একটি পদ্ধতি সত্যবাবুকে অস্বস্তিতে ফেলে। সেটি হচ্ছে নিখুঁত চিত্রনাট্য হাতের কাছে না নিয়ে কাজ করা। তিনি বলেন—'চিত্রনাট্য না থাকার দরন হয়ত প্রয়োজন ও



পরিবেশ মত দৃশ্যের রদবদল করা যায়, স্পনটিনিটিও আসে। কিন্তু তাতে ছবি খারাপ হবার আশংকা থাকে না কি?'

মৃণাল সেনের শিল্পীদের গাইড করা সম্পর্কে সত্যবাবু অবশ্য প্রশংসামুখর। তিনি কখনই নাকি অভিনয় করে দেখিয়ে দেন না তিনি কি চান। শিল্পীকে শুধু সিচুয়েশনটা বুঝিয়ে দিয়ে নিজের মত করে করতে বলেন। শিল্পীর নিজস্বতায় তিনি সহজে হাত দেন না। মৃণাল সেনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এটাই।

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মৃণাল সেনের পরিচয় এল টি জি-র সময় থেকে। 'কলকাতা ৭১' ছবিতে মৃণাল সেন ওঁকে প্রথম নেন। তারপর 'কোরাস' এবং সর্বশেষ 'একদিন প্রতিদিন'। তিন-তিনটি ছবিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত তৈরি হয়েছে: মানুষ হিসাবে মৃণাল সেন তুলনাহীন। অমায়িক, অসাধারণ ভালো ব্যবহার। যে কোন পরিবেশে যে কোন মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন। অথচ ছবিতে সেই একাত্ম হবার ঘাটতি কেন বুঝতে পারেন না।

সত্যজিৎ রায়ের ব্যাপারটা আবার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ মানুষ। চট করে সবাই যেমন তাঁর কাছে সহজ হতে পারে না, সত্যজিৎবাবুও পারেন না। কিন্তু ওঁর ছবিতে সেই সহজতা ও সারল্য আছে—যা সবাইকে ভালো লাগায়। ভালোবাসায়। সত্যজিৎ রায়ের ছবির প্রধান গুণ তাঁর সুন্দর বর্ণনাভঙ্গি। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—'দুজনেই ভালো পরিচালক। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এখনও সত্যজিৎ রায় বেশি প্রিয়। মাঝে মাঝে আমারও তাই মনে হয়।'

মৃণালদা ছবির চরিত্রকে নিয়ে দারুণ ভাবনা চিন্তা করেন। 'ওকা উরি কথা'র নীলাম্মা করতে গিয়ে আমাকে কি কি আদেশ দিয়েছিলেন উনি শুনুন—(১) চুলে শ্যাম্পু করতে পারব না। (২) চুলে চিরুনি লাগাতে পারব না। (৩) ভুরু প্লাক করা চলবে না। (৪) চুলে তেল দেওয়াও বন্ধ। (৫) চটি পরতে পারব না। (৬) সব সময় গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে মিশতে হবে।

অভিনয় সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ: 'আগে তুমি করো, দেখি। তারপর বলব।'

মমতাশংকরের মতে, 'মৃণালদা কখনও কাউকে নিজে অভিনয় করে, দেখিয়ে দিয়ে ইনফ্লুয়েনস করেন না।' শিল্পীর কাছ থেকে কাজটা বার করে নেন। 'আমি তো ডানসার। নাচের ব্যাপারটা ঘাড়ে কিংবা বডি মুভমেনটের মধ্যে যদি এসে যায়, তাই সাবধানে থাকতাম। 'মৃগয়া'তে দেখলাম আসেনি। তারপর ভয়টা কাটল।'

মৃণাল সেনের ধরাবাঁধা কোন চিত্রনাট্য না থাকায়, মমতা মনে করেন 'রিল্যাক্স করে কাজ করা যায়। টাইট চিত্রনাট্য থাকে না বটে, কিন্তু মৃণালদা মনে মনে সবই ঠিক করে রাখেন।'

মমতা এ পর্যন্ত মৃণাল সেনের তিনটে ছবিতে কাজ করেছেন। প্রথমে ঠিক ছিল 'একদিন প্রতিদিন'এ তিনি ছোট বোনের রোলটাই করবেন। 'কিন্তু হল না। তখন সবেমাত্র আমার বাচ্চা হয়েছে। বেশি দৌড়ঝাঁপ করা, ওঠানামা একেবারে বারণ। সকাল-বিকেল দুবেলা বেরোতেও পারব না। তাই মৃণালদাকে বললাম—বড় বোনের রোলটাই দিন. করি।' এটা ওঁর বড় আফশোস। ঐ ছবিতে ছোট



বোনই বলতে গেলে রিয়্যাল প্রোটাগনিসট।

মানুষ হিসাবে মৃণাল সেন কেমন? মমতার মতে—'যা উনি বলেন, তাই করেন। কাউকে খুশি করার জন্য কিছু করেন না কখনও। এত ছবি করার পরও মৃণালদাই একমাত্র ডিরেকটর যাঁর বাড়ি নেই, গাড়িও নেই। খুব আমুদে, মুডি। আবার কাজের সময় অসম্ভব সিরিয়াস। এতটুকু ইনসিনসিয়ারিটি দেখলে রেগে যান। আবার ইউনিটের সকলের লেগপুল করতেও তিনি ছাড়েন না।'

অভিনয় করে বুঝিয়ে দেন —শ্রীলা



মৃণালদার মত অভিনেতা আমি খুব কম দেখেছি। পরিচালক হিসাবেও তিনি তুলনাহীন।—এ মন্তব্য তরুণী অভিনেত্রী শ্রীলা মজুমদারের। শ্রীলা মৃণাল সেনের নতুন ছবি 'আকালের সন্ধানে'-র কাজে ব্যস্ত। 'পরশুরাম' ও 'একদিন প্রতিদিন'-এ শ্রীলা নায়িকা চরিত্রে কাজ করেছে। 'একদিন প্রতিদিন'-এ তাঁর কাজ দারুণ প্রশংসা পেয়েছে।

বয়স আঠাশের মত। রঙ ময়লা। প্রথাগত নায়িকা হতে গেলে ও রঙ চলে না। কিন্তু মৃণাল সেন চিরদিনই নিয়ম ভাঙার দলে। শ্রীলাকে প্রথম নিয়েছিলেন 'পরশুরাম'-এ বস্তির অনাথ মেয়ের চরিত্রে। রঙ ময়লা হলেও শ্রীলার চেহারায় একটা দীপ্তি আছে।

নতুন ছবির লোকেশন সোমড়া বাজারের গঙ্গার ধারে বসে কথা হচ্ছিল ওর সঙ্গে। শ্রীলা বলল—'মৃণালদা যেভাবে অভিনয় করে দৃশ্য বুঝিয়ে দেন, তাতে বাড়তি আর কিছু করার দরকার হয় না।'

: আপনার নিজস্বতা তাতে হারিয়ে যায় না ?

শ্রীলার চটপট জবাব : নিজস্বতার দরকার কি ? পরিচালক যা চাইছেন তাই যদি দিতে পারি, তাহলেই তো হল। বরং নিজস্বতা দেখাতে গেলে ইমেজের গণ্ডীতে বাঁধা পড়ে যাবো।

শুরু থেকেই মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করতে পারায় শ্রীলা খুব খুশী। 'ভালো ট্রেনিং পাচ্ছি। তাছাড়া অমন দিলখোলা, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা মানুষ দ্বিতীয়টি দেখিনি।'



কান উৎসবে (১৯৭৬) মৃণাল সেন

পুরস্কারের তালিকা

পুনশ্চ (১৯৬১ সালে সেরা আঞ্চলিক ছবি হিসাবে রাষ্ট্রপতির পদক), **আকাশ কুসুম** (১৯৬৫—সেরা আঞ্চলিক ছবি হিসাবে রাষ্ট্রপতির পদক), **মাটির মনিষ** (১৯৬৬—সেরা আঞ্চলিক ছবি হিসাবে রাষ্ট্রপতির পদক), **ভুবন সোম** (১৯৬৯—রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ও সেরা পরিচালকের পুরস্কার), **ইনটারভিউ** (কার্লোভিভ্যারি উৎসবে সেরা অভিনেতার পুরস্কার—১৯৭০, শ্রীলংকা আন্তর্জাতিক উৎসবে সমালোচকদের পুরস্কার ১৯৭১), **এক আধুরি কহানী** (ম্যানহাইম উৎসবে অন্যতম সেরা ছবি হিসাবে স্বীকৃতি), **কলকাতা-৭১** (১৯৭২ সালে দ্বিতীয় সেরা ছবি হিসাবে রাষ্ট্রপতির পদক), **পদাতিক** (সেরা চিত্র-নাট্যের জন্য রাষ্ট্রপতির পদক, ১৯৫৩), **কোরাস** (সেরা ছবি হিসাবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণকমল-১৯৭৫ ; মসকো উৎসবে রৌপ্য পদক-১৯৭৫ ; বার্লিন উৎসবে FIPRESCI পুরস্কার-১৯৭৫), **মৃগয়া** (রাষ্ট্রপতির স্বর্ণকমল-১৯৭৬), **ওকা উরি কথা** (সেরা আঞ্চলিক ছবি হিসাবে রাষ্ট্রপতির পদক-১৯৭৭ ; কার্লোভি ভ্যারি উৎসবে বিচারকদের বিশেষ পুরস্কার-১৯৭৮, মসকো উৎসবে দ্বিতীয় সেরা ছবির পুরস্কার-১৯৭৮, কার্থেন উৎসবে বিশেষ পুরস্কার-১৯৭৮), **পরশুরাম** (সেরা আঞ্চলিক ছবি হিসাবে রাষ্ট্রপতির পদক-১৯৭৮, মসকো উৎসবে রৌপ্য পদক-১৯৭৮), **একদিন প্রতিদিন** (সেরা আঞ্চলিক ছবি হিসাবে ও সেরা পরিচালক হিসাবে রাষ্ট্রপতির পদক-১৯৭৯)।


চিন্তা ভাবনা অনেক কিছুই বদলে গেছে,
বদলায়নি শুধু একটি.....
সঞ্চয়ের জন্য ভাবনা
কিন্তু আজও বদলায়নি।
ঠাকুরদা সঞ্চয় করেছেন।
বাবা করেছেন। ছেলে করছেন এবং তাঁর
ছেলেও করবে।
সেই সঞ্চয়ের চিন্তাকে যাতে বাস্তবে রূপ দেওয়া
যায় তার জন্য আমরা নিরন্তর
চেষ্টা করে চলেছি।
(স্থাপিত ১৯৩২)
দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স
এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
I.P/80

নিহত অধ্যাপক বিহারের ছাত্রদের সুমতি ফেরাতে পারবেন কি ?

জীবনময় দত্ত

পাটনার টি পি এস কলেজ-এর গেট। বেলা ১টা। কড়া রোদে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকশো ছাত্র, অভিভাবক, পুলিশ। সকলের মুখ তপ্ত, ঘর্মাক্ত। উত্তেজনায় ও আশংকায় পরিবেশ বেশ রমরমে। বেলা দুটো থেকে মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ/আই এস সি পরীক্ষা শুরু।

বিহার সরকারের সাম্প্রতিক এক অরডিন্যান্সের ভাষ্য অনুসারে পরীক্ষায় টোকাটুকি করা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কারাদণ্ডের সীমা ৩ বছর পর্যন্ত চলতে পারে; অর্থদণ্ডের পরিমাণ হতে পারে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত। পরীক্ষকদের কেউ যদি টুকতে সাহায্য করেন তাহলে সেটাও হবে দণ্ডযোগ্য অপরাধ। পরীক্ষকরা 'লোক সেবক' হিসেবে পরিগণিত হবেন। ছাত্রদের পরীক্ষায় টোকাটুকি, চুরি বা অন্য অসদুপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে ভারতের আর কোন রাজ্য এ ধরনের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেনি এখনও পর্যন্ত।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। স্বভাবতই সমস্ত পরিবেশ উত্তেজনা ও অজানা শংকায় কাঁপছিল। প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রেই ছিল পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটে ভর্তি।

টি পি এস কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দেখি ঐ কাণ্ড। প্রত্যেক ছাত্রকে ৪ জন পুলিশের বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে যাবার অনুমতি পেতে হচ্ছে। নিজের পরিচয় জানিয়ে ভেতরে ঢুকে একজন ছাত্রকে ধরে ওর এই নতুন ব্যবস্থায় প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলাম। আমাকে উলটে সে প্রশ্নটি করল—আমাদের সমাজে কারা সবচেয়ে সৎ বলতে পারেন? স্বভাবত জবাব দিতে পারলাম না। ওর মুখের দিকে তাকালাম। নতুন গজিয়ে ওঠা গোঁফ-দাড়ি কামায়নি ক'দিন। সরু ফ্রেমের চশমার ভেতরে চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল। কপালে, নাকের পাটায় ঘাম বিজ বিজ করছে। সারা মুখে আসন্ন পরীক্ষা এবং পরিস্থিতিজনিত টেনশান।

আমায় নিরুত্তর দেখে সে আবার প্রশ্ন করলো—'এবার বলুন তো শাসনযন্ত্রের কোন অংশ সবচেয়ে কোরাপট?' কোন দিকে ইঙ্গিত করছে ছেলেটি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ছেলেটি সমান গলায় বলে উঠল 'পুলিশ। এই পুলিশকে দিয়েই জগন্নাথ মিশ্রের সরকার পরীক্ষায় চুরি বন্ধ করাবে। কী ট্রাজেডী আমাদের বলুন তো।' ছেলেটির সময় হয়ে যাচ্ছিল। কথা শেষ করেই দ্রুত এগিয়ে গেল হলের দিকে।

পরীক্ষায় চুরি ও অসদুপায় অবলম্বন করা বিহারে এত ব্যাপক হারে হচ্ছে যে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাই ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। সরকার ব্যবস্থা নিয়েছেন। তার ফল কী হলো শেষ পর্যন্ত?

পাটনার কাছেই আরা। পরীক্ষার প্রথম দিন শেষ। হলে সেদিন আর কোন বড় ঘটনা ঘটেনি। শিক্ষকরাও মোটামুটি নির্ভয়ে নিজেদের কাজ করেছেন। টোকাটুকির ঘটনা কমই হলো প্রথম দিন। এইচ ডি জৈন কলেজের অধ্যাপক বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ সিং দিন শেষের ক্লান্তি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই। জনাকীর্ণ রাস্তায় একদল ছেলে বিন্ধ্যেশ্বরীকে ঘিরে ফেলল। লোহার রড দিয়ে এলোপাথাড়ি মেরে পালাল। নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা। কেউ এগোতে সাহস পেল না। রক্তাপ্লুত প্রফেসারকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখান থেকে পাটনার ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। জীবন-মরণ লড়াই চললো ডাক্তারে-রোগীতে। মাথার আঘাত মারাত্মক। দিল্লির অল ইনডিয়া ইনসটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েনসের ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। তারা পরামর্শ দিলেন বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করতে। সরকার সেভাবেই সিদ্ধান্ত নিলেন। দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হলো ওঁকে। সেখানে বড় নিউরো সারজনসহ অন্য ডাক্তাররা চালালেন জীবন-মরণ সংগ্রাম।

এদিকে সারা বিহারে ধিক্কার উঠল সব রকমের মানুষের কাছ থেকেই। পরীক্ষা থামল না। থামল না পরীক্ষকদের ওপর হামলাও। টি পি এস কলেজে পাটনার তিনজনের ওপর ছুরি চালানো হলো। পরের দিন পাটনারই কলেজ অফ কমার্সের কয়েকজন আক্রান্ত হলেন রাজেন্দ্রনগর রেলওয়ে গুমটিতে। বোরিং রোডের মোড়ে এ এন কলেজের শিক্ষকরা আহত হলেন গুণ্ডাদের হাতে। ক্রমশ অবস্থা হিংস্র হয়ে উঠছিল। কলেজ শিক্ষকরা এই অব্যবস্থা ও জীবন সংশয়ের আতংকে একত্রিত হয়ে আবেদন জানালেন—সরকার উপযুক্ত সুরক্ষা ও শান্তির ব্যবস্থা নিন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন ওঁরা। কিছুই হলো না খবরের কাগজে দুঃখ ও নিন্দা প্রকাশ ছাড়া। আক্রমণ অব্যাহতই রইল। শিক্ষকরা আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হতে থাকলেন।

এই অবস্থা চলল ১৩ সেপটেমবর পর্যন্ত। নিরুপায় শিক্ষকরা শেষ পর্যন্ত প্রাণরক্ষার তাগিদে হুমকী দিলেন পরীক্ষা বর্জনের। সরকার দু'দিন পরীক্ষা স্থগিত রাখলেন। নতুন করে পুলিশী ও অন্যান্য বন্দোবস্ত করে ১৫ ও ১৬ সেপটেমবর পরীক্ষা বন্ধ থাকার পর আবার তা শুরু হলো।

এবার প্রতিবাদ উঠল ছাত্রদের তরফ থেকে। মফস্বল শহরগুলোর পরীক্ষা কেন্দ্রে নাকি এত কড়াকড়ি নেই। ফলে ওসব জায়গায় চুরি অব্যাহত রয়েছে। পাটনার কয়েকটি কলেজের ছাত্ররাই মাঝখান থেকে এই কড়াকড়ির শিকার হয়ে ভাল ও পছন্দ মতো পরীক্ষা দিতে পারছে না। এই বিভেদ ও পার্থক্য চলবে না বলে ধ্বনি ওঠাল ছাত্ররা। থেমে রইল না কিছুই। পরীক্ষাও চলল। ছাত্রদের প্রতিবাদও বজায় রইল। পুলিশ নিজের মতো করে পরীক্ষায় তথাকথিত সততা রক্ষা করলো। আহত শিক্ষকরা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন।

থেমে গেল শুধু একজনের জীবনের গতি। প্রফেসর বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ সিং-এর জীবনরক্ষা পেল না। ২৫ সেপটেমবর সকালে প্রফেসার সিং মারা গেলেন মাত্র ৪২ বছর বয়সে। বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষার্থী ছেলে আর একটি মেয়ে চোখে কান্নার সমুদ্র নিয়ে পেছনে পড়ে রইল। ২৬ তারিখে মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থগিত রইল স্বর্গত প্রফেসারের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। বিহার সরকার প্রফেসার সিং-এর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করার কথা ঘোষণা করেছেন।

এই জীবনদানে কোন লাভ হলো কই! পরীক্ষা শেষ হবার পর সরকার ঘোষণা করলেন খাতা পরীক্ষা করা হবে কেন্দ্রীয়-ভাবে। অর্থাৎ খাতা আর কোন পরীক্ষকের কাছে যাবে না। মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে কড়া পাহারায় পরীক্ষকরা খাতা দেখবেন। তাতেও কত কাণ্ড! হাজার পাঁচেক মানুষের ভিড় জমে উঠল খাতা পরীক্ষা-কেন্দ্র ঘিরে। সবার পকেটে বহু রোল নমবর। সকলেই এসেছে 'পৈরভী' বা সুপারিশ করতে। কাজ করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। এখানেই কিন্তু শেষ নয়। কয়েকজন পরীক্ষক ধরা পড়লেন পরীক্ষার্থীদের পকেট ভর্তি রোল নমবরসহ। খোঁজ নিয়ে জানা গেল—সব রোল নমবরই বড় বড় কর্তাদের ছেলেমেয়েদের।

এই হলো মগধ বিশ্ববিদ্যালয়, বিহারের ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষা-পর্ব। ছাত্ররা চুরি করবেই। অভিভাবকরা 'পৈরভী' করবেই। সরকারও নাকি বিহারে পরীক্ষায় সাধুতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

কিন্তু বিষ যে আরও গভীরে। কে এই বিষ বার করবে? ধারণ করবে কণ্ঠে? হবে বিহারের শিক্ষা ক্ষেত্রের এক নতুন নীলকণ্ঠ?

স্বর্গে প্রফেসার বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ সিং-এর আত্মাও সেদিনটির প্রতীক্ষায় দিন গুণবে। ★

যন্ত্রগণক শিশু

ব্রিটিশ-বিজ্ঞানীরা একটি মডেল যন্ত্রগণক শিশু তৈরি করছেন। এই বিজ্ঞানীরা সকলেই এডিনবুরগ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ব বিভাগের গবেষক দল। এদের উদ্দেশ্য, স্বাভাবিক শিশুদের মানসিক বিকাশের প্রথম স্তরটিকে তুলে ধরা। প্রায় ১ হাজার শিশুর ১০ বছরের আচরণ নিরীক্ষাই এর ভিত্তি। এই যন্ত্রগণক কার্যক্রমের মাধ্যমে সুস্থ শিশুদের মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলিও এতে ধরা পড়বে। এই তথ্যগুলি থেকে হয়ত প্রতিবন্ধী শিশুদেরও কিছুটা স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে সাহায্য করা যাবে।

শান্তি-নিকেতন

বৃটেনের গরডন-স্টোন স্কুলের ৯টি শ্রীমান বহিষ্কৃত হল। খুব গাঁজা টেনেছিলো তারা। গরডন স্টোন স্কুল একটি সম্ভ্রান্ত বেসরকারী শিক্ষায়তন। বৃটিশ রাজ-পরিবারের প্রিনস চারলসও এর ছাত্র। বছর তিনেক আগে একই অপরাধে এখান থেকেই একটি ছাত্রী-সমেত ৬ জন বহিষ্কৃত হয়েছিল। তাদের একজন গ্রীসের জাহাজ শিল্পপতির পুত্র। ১৯৭০-এও ৩ জন বিতাড়িত হয়েছে। স্কুলটিতে পড়তে ছাত্র পিছু বাৎসরিক সেলামী প্রায় ৪৮ হাজার টাকা।

বিদায়—ভালোবাসা

পাকিস্তানের অন্যত্র ভালবাসার ফরমান থাকলেও তার একাংশের স্পষ্ট যুদ্ধ-ঘোষণা, ভালবাসার বিরুদ্ধেই। সম্প্রতি উর্দু দৈনিক 'মাশরিক' জানাচ্ছে, ওদেশের নীতি-বিজ্ঞানীরা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য সূচীর সমস্ত গদ্য-পদ্য থেকে 'প্রেম' কথাটি তুলে দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন। নিবন্ধটির লেখক আবদুল সালাম খুরশীদ বলেছেন, মীর ও গালিব থেকে ইকবাল পর্যন্ত এমন কোনো কবি নেই, যিনি ঐ শব্দটি ব্যবহার করেননি। প্রেমের বিরুদ্ধে এই জেহাদ ইতিমধ্যে চলচ্চিত্র শিল্পেও ঘোষিত হয়েছে। ১৯৭৭-এর আগের সমস্ত ফিলমগুলি সেনসর করার জন্যে সরকার আদেশ দিয়েছেন। ফলে কাঁচি চলেছে প্রেম-দৃশ্যে। উর্দু দৈনিক 'ইমরোজ'-এর মতে, জনরুচি নিম্নমুখী হয়েছে চলচ্চিত্রের কল্যাণে।

গণতন্ত্র !

'দি প্রেস অ্যানড ডেমোক্রেসি'—এই শিরোনামে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন স্পেনের নামজাদা দৈনিক এল পাইস-এর সম্পাদক সেনর জুয়ান লুইস সিবরিয়ান। ফলে, কপালে জুটেছে তিন মাস হাজতবাস আর অর্থদণ্ড।

মজার ব্যাপার, নিচু আদালত কিন্তু প্রথমে সেনর সিবরিয়ানকে ততোটা পাত্তা দেননি। সেখানকার বিচারপতি সম্পাদকীয়টি পড়ে রায় দিয়েছিলেন, সম্পাদক নির্দোষ, তবে একেবারে বেকসুর খালাস নয়, জরিমানার তঙ্কা লাগবে চল্লিশ পাউনড। সেনর সিবরিয়ান বললেন, উঁহু, ফাইন-টাইন দেবো না। আপিল করবো সুপ্রিম কোরটে।

আপিল করতেই বিপত্তি। গণতান্ত্রিক স্পেনের সুপ্রিম কোরটের রায়ঃ তিন মাস জেল আর জরিমানা।

এদিকে, এল পাইস কিন্তু আবার এক ধারালো সম্পাদকীয় ছেপেছে। বক্তব্যঃ ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কো আজও বেঁচে রয়েছে।

বহুমূল্য শূন্যতা

আমেরিকান শিল্পী অ্যাগনেস মারটিনের একটি শিল্পকর্ম কিনেছেন ডাবলিন করপোরেশন একুশ হাজার ডলার দিয়ে। আর এই ছবি কেনাকে কেন্দ্র করে করপোরেশনের সাংস্কৃতিক কমিটিতে হয়েছে তুমুল বাকবিতণ্ডা, ভোটাভুটি! কারণ ?—এই ছবিটি আর কিছুই নয় একটি শূন্য ক্যানভাস! করপোরেশনের মডারন আরট গ্যালারীতে শোভা পাবে এই আধুনিক চিত্রকর্মটি!

সর্ষের মধ্যেই

তদন্তের ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দাকে ঘুষ দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে রোডারিক ম্যাকলিয়ডকে ১৮ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হল। ম্যাকলিয়ড নিজে একজন অবসর প্রাপ্ত গোয়েন্দা বিভাগীয় প্রধান। ২৬ বছর তিনি স্কটল্যানড ইয়ারডের জালিয়াতি-নিরোধক বিভাগে স্বয়ং যুক্ত ছিলেন এবং এই মামলাটির পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ম্যাকলিয়ড তার-সহঅপরাধী হ্যারলড স্টুয়ারটের সঙ্গে তার অপরাধ কবুল করেছেন আদালতে। হ্যারলড স্টুয়ারট একজন প্রকাশক। একটি ইনডাসট্রিয়াল ডাইরেকটরি প্রকাশের ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে যে মামলা চলছিল তার অনুসন্ধান বন্ধ করার জন্যেই এই ঘুষের টোপ দেওয়া হয়েছিল!

'মিনি স্কার্ট পরুন, পেট্রোল বাঁচান'

মেয়েদের গাড়ি চালানোর ব্যাপারে অনেকেই কপাল কোঁচকান। পশ্চিম জারমানির পেট্রোল ব্যবসায়ীরাও। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় তারা দেখিয়েছেন লম্বা স্কারট পরা মেয়েরা গাড়ি চালালে স্টিয়ারিং ও অ্যাকসেলারেটার ব্যবহারে অসুবিধা হয়, ফলে পেট্রোল ব্যবহার বেশি হয়। সুতরাং সুন্দরীরা মিনি পড়ুন, ম্যাকসিমাম পেট্রোল বাঁচান। ভারতের শাড়ি-পরিহিতা মটর-চালিকারা ভেবে দেখবেন।



সিঙ্গাপুরী চাকরি

সিঙ্গাপুরের ইলেকট্রোনিক শিল্পে এখন শ্রমিক-সংকট। কাজের লোক জোগাড়ের জন্য চলছে নানান ফন্দি-ফিকির। কোনো সংস্থা এক মাস কাজের জন্যে ১২ জন জুটিয়ে দিলে প্রায় ২৪০০ টাকা দিচ্ছে। কেউ বা আরও একধাপ এগিয়ে কর্মী 'হাইজ্যাক' করছে। তারপর চা খাইয়ে নতুন চুক্তিপত্র হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে। লোক জোগাড়ের জন্যে অনেক সংস্থা পে-প্যাকেটে প্রলোভনের ফাঁদ পাতছে। তাতে লেখাঃ তিন মাসের কাজের লোক জোটালে বোনাস মিলবে ৪৫০ টাকা, লাকী ড্রয়ের টিকিট আর প্রমোদ-ভ্রমণের সুযোগ। টোপ ঝুলছে পদোন্নতির, মাইনে বাড়ানোর। হপ্তায় ৫ দিন কাজ, মাইক্রোস্কোপ দেখার ঝামেলা নেই, বিয়ে ও অসুস্থতার ছুটি মিলবে ও আরো অনেক অনেক সুবিধে মিলবে—এমনি হাজারো সুবিধার লিসটি!

না, না, না

আমস্টারডামের সেনট্রাল স্টেশনে এক অদ্ভুত নোটিশ ঝুলছে। এটি অসহযোগিতার একটি বে-নজির বিজ্ঞাপন। ডাচ রেল ভ্রমণের এই তথ্যকেন্দ্রের সদম্ভ ঘোষণাঃ ট্রেন সংক্রান্ত খবর মিলবে না এখানে। নৌকোরও না। আন্তর্জাতিক টিকিট নেই। শহরের ম্যাপও অমিল। পর্যটক ও হোটেলের খবরও এখানে পাওয়া যাবে না।

যুদ্ধাপরাধী

নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের পোল্যানড ও পশ্চিম জারমানীতে বিচারের জন্যে পাঠানো হবে। মারকিন বিচারক সংক্রান্ত বিশেষ তদন্ত সংস্থার প্রধান অ্যালান রায়ান জুনিয়ার ঐ দুটি দেশের বিভাগীয় কর্তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনার জন্যে যাবেন। ১৯২৯ সাল থেকেই পোল্যানড ও আমেরিকার মধ্যে বন্দী বিনিময় চুক্তি ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পোল্যানড সোভিয়েট শিবিরে যোগ দিয়েছে। তারপরে কোনো মারকিন নাগরিককে বিচারের জন্যে পোল্যানডে পাঠানোর নজির নেই। মারকিন বিচার বিভাগ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এসব ক্ষেত্রে প্রথমে অভিযুক্ত ব্যক্তির নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে। পরে তাদের বহিষ্কার করা হবে। কিন্তু আইন বিভাগীয় কর্তারা জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে আইনগত অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

পাপ্পু এবং ছেলেধরা

ডাক নাম পাপ্পু, ভালো নাম শামীম হোসেন। বয়স তেরো। যে-সে ছেলে নয় পাপ্পু, প্রেসিডেন্টের সোনার মেডেল পাওয়া দশজনের একজন। পড়ে ক্লাস নাইনে। মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত পাপ্পু বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশে প্রথম হয়েছে।

এই সোনার ছেলেকে একদিন খুঁজে পাওয়া গেল না। সে গিয়েছিল মসজিদে মগরেবের নামাজ পড়তে। সন্ধ্যে থেকে রাত্রি। রাত্রি ভোর হল সারা খুলনা শহরে হৈচৈ।

এবার পাপ্পুর মুখ থেকেই শুনুন : আমি যাচ্ছিলাম মসজিদে। পথে দুটো লোক আমাকে ডাকলো। কাছে যেতে তারা জোর করে আমার হাতে একটা ইনজেকশান দিয়ে দিল। তার পর মনে নেই কিছু।

: জ্ঞান ফিরতেই দেখলাম আমি একটা স্টিমারে, এটা তো ঢাকা যাবার স্টিমার। আমি সঙ্গে সঙ্গে স্টিমারের লোকজনদের বললাম। তারা বল্লেন, আমি ছেলেধরার খপ্পরে পড়েছিলাম। ছেলেধরা দুটোকে খুব খোঁজা হলো ঐ স্টিমারে—পাওয়া গেলনা।

এরপর পাপ্পুকে স্টিমারের লোকেরা ফিরিয়ে দিয়েছেন তার মা-বাবার কোলে। (দৈনিক বাংলা)

রোজি সামাদের পরিত্রাণ

ভক্তের পাল্লায় পড়ে খুব নাজেহাল হয়েছিলেন রোজি সামাদ। চিত্রাভিনেত্রী রোজি গিয়েছিলেন শ্বশুরবাড়ি সিলেটে ঢাকায় ফেরার পথে মিষ্টি খেতে সাধ হলো তার। গাড়ি থামালেন এক মিষ্টির দোকানের সামনে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে দেখেন ভক্তের দল ঘিরে ফেলেছে তার গাড়ি। নানান প্রশ্ন তাদের কারও কারও দাবি, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে চাই রোজির হাতের বইগুলি। রোজি বই দিতে নারাজ, অটোগ্রাফ দিতে রাজি। ভক্তরা তাতে রাজি নয়।

শেষে স্থানীয় কিছু লোক এসে ভিড় সরিয়ে দিতে 'মুক্ত' হলেন ছায়াছবির নায়িকা। (চিত্রালী)

বিষাক্ত 'প্রজাপতি'

পাত্র চাই ? ডাক্তার, এনজিনিয়র, অফিসার সব রকম পাত্র মিলবে।—বিজ্ঞাপন দেখে অনেকে যোগাযোগ করতেন হাওলাদার মোখলেসুর রহমানের প্রজাপতি অফিসে —'বৈবাহিক যোগাযোগ সংস্থায়'। অফিসের ঠিকানা, মহম্মদপুর।

একটু অন্যরকম গন্ধ পেয়ে একদিন এলো পুলিশ। তারপর বেড়াল বেরিয়ে পড়লো ঝুলি থেকে : হাওলাদার আসলে নারী ব্যবসায়ী, চিঠি দিয়ে গ্রাম-মফঃস্বলের সরলমতি মেয়েদের ডেকে এনে সে তুলে দেয় পাত্র, থুড়ি 'খদ্দেরদের' হাতে।

প্রজাপতি এখন পুলিশের জালে আটকা। (দৈনিক বাংলা)



চিত্রতারকা নূতন/ বাংলাদেশ টাইমস

নৃশংস

লোহার রড আর কুড়ুলের ঘায়ে মারাত্মকরকম আহত হয়ে মহর শেখ ভর্তি হয়েছিল সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে। একটু একটু ভালো হচ্ছিল সে। কিন্তু সেখানেও এলো ঘাতকেরা। মাঝরাতে বেড খুঁজে খুঁজে মহরকে বার করল মুখোশধারী আততায়ীরা। তারপর ছুরি মেরে শেষ করলো তাকে।

(দৈনিক বাংলা)

ববিতার বিয়ে

চলচ্চিত্র নায়িকা ববিতা, যিনি ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে পণ করেছিলেন বিয়ে করবেন না, মত পালটেছেন। হ্যাঁ, খবর একেবারে পাকা মিয়া বিবি রাজি।

মিয়া, ইফতেখারল আলম। নিবাস চট্টগ্রাম। পেশা, জাহাজ-ব্যবসা।

ববিতার আত্মীয়া আরেক চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সুচন্দা নিমন্ত্রণ করে ইফতেখারুলকে নিয়ে এসেছিলেন তার বাড়িতে। সেখানে নিভৃতে ববিতা ও ইফতেখারুলের আলাপ পরিচয় হয়

তারপর ইফতেখারুল বলেছেন, হ্যাঁ রাজি। আর লজ্জারাঙা ববিতার মতামত : ছোট্ট একটি 'হু''। (চিত্রালী)

বাঃ বাঃ বাটা

রাস্তার ধারে রেল স্টেশনে যারা জুতো মেরামত ও পালিশ করেন, তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের বাটা সু কোমপানি। বাটার 'প্রগতির সহযাত্রী' প্রকল্পের অংশীদার হয়েছেন সদরঘাট অঞ্চলের বহু জুতো-পালিশওয়ালা। বাটা কোমপানি বিনামূল্যে তাদের দিয়েছেন জুতো পালিশ ও মেরামতের সাজসরঞ্জাম।

(দৈনিক বাংলা)

খাঁকি রঙের জানোয়ার

গ্রামের নানারকম দুর্নীতির প্রতিবাদ করেছিলেন মকিমপুরের এক গৃহস্থ। তারপর ব্রাহ্মণপাড়া থানার ও সি এলো পুলিশ নিয়ে। গৃহস্থটির বাড়ি থেকে প্রথমে ওরা নিয়ে গেলো গৃহস্থের ন বছরের ছেলেকে। তারপর আবার এসে জোর করে ধরে নিয়ে গেল গৃহস্থের যুবতী কন্যাকে। না, হাজতে নয়, ও সি'র বাড়িতে। তারপর···

৯০ ঘণ্টা পরে মেয়েটি যখন ফিরে এলো তখন সে আর কুমারী নয়।

ঐ মেয়েটির বিয়ের কথা চলছিল—পাত্রপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে এখন তা আর সম্ভব নয়। (দৈনিক বাংলা)

বিউটি এ্যানড দ্য বিসট

শুটিং সেরে বাড়ি ফিরছিলেন বিউটি, বাংলাদেশের নতুন চলচ্চিত্র নায়িকা। সঙ্গে ছিলেন তার মা। রাত তখন দশটা। পথে কে বা কারা ছুঁড়ে মারলো এ্যাসিড বালব। বিউটি ও তার মা দুজনেই আহত হলেন। বিউটির দুটো চোখই মারাত্মক জখম হয়েছে।

(চিত্রালী)

টাকা পোড়াবেন না

সিগারেট, বিড়ি, চুরুটের পিছনে বাংলাদেশের ধূম্রসেবীরা বছরে ৭০০ কোটি টাকা ব্যয় করেন। বিদেশ থেকে সিগারেট আমদানী করতে বছরে ব্যয় হয় প্রায় দুশো কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা।

না, এভাবে টাকা পোড়াবেন না। ও নেশা ত্যাগ করুন।—দেশের দু-কোটি ধূমপায়ীর কাছে আবেদন করেছেন ডঃ আলমগীর, জাতীয় ধূমপান প্রতিরোধ সমিতির সাধারণ সম্পাদক।

(দৈনিক ইত্তেফাক)

ছদ্মবেশী

খলিল আর তসলিম নামের দুই তরুণকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। দুজনেরই ঠাঁই মিলেছে নাটোরের সাব-জেলে, মহিলা ওয়ারডে। মহিলা ওয়ারডে কেন ? হ্যাঁ, ওইখানেই আসল রহস্য।

আসলে খলিল আর তসলিম দুজনেই তরুণী। ওদের আসল নাম যথাক্রমে জরিনা আর তসলিমা জীবনের ভিন্নতর স্বাদ নেবার লোভে পুরুষ সেজে ঘর ছেড়েছিলো ওরা তসলিমা তো ধোঁকা দিয়ে একটি মেয়েকে বিয়ে পর্যন্ত করেছিলো।

(দৈনিক বাংলা)

কারটার যা পারেননি, রেগান তা পারবেন ?

যীশু চৌধুরী

রেগানের নির্বাচনী সভায় মিচিগানের কংগ্রেসম্যান গাইভ্যানডার জ্যাস্ট বক্তৃতার শুরুতে হঠাৎ আবৃত্তি করে উঠলেন হেনরি ভ্যান ডাইকের কবিতা 'অ্যামেরিকা ফর মি', 'I know that Europe's wonderful, yet something/Seem to lack:/ The past is too much with her, and the people/Looking back,/ But the glory of the present is to make the/Future free—/We love our land for what she is and what/She is to be.'

মার্কিন ধরনের দেশপ্রেম অবশ্য কী জিনিস তা এ কবিতা থেকে বোঝা গেছে কিনা সে বিচার করবেন ভোটদাতারাই। কিছুদিন আগে কোন একটি মার্কিন সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রশ্ন তুলেছিল 'Who will fight for America ?' ইরাণের হাতে বন্দী কূটনীতিবিদদের উদ্ধার করার জন্য কারটার যে বিমানবহর পাঠিয়েছিলেন তা ওড়বার আগেই মরুপ্রান্তরে মুখ থুবড়ে পড়ার পর এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি দেখিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জওয়ানদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত। সে কারণে কমপিউটারচালিত যুদ্ধাস্ত্র কাজে লাগানোর মত লোকের ভয়াবহ রকমের অভাব। আর তাই এ পরিণতি।

এ পরিণতি যে প্রশাসনযন্ত্র বা রাষ্ট্রযন্ত্র চালাবার ব্যাপারেও ঘটবে না সে কথা কে বলতে পারে ? দেশপ্রেম যে বায়বীয় পদার্থ নয় সে কথা বুঝতেন কারটার, রেগানও নিশ্চয়ই বোঝেন।

রেগানের হয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে জেরালড ফোরড এক জায়গায় বলেছিলেন, 'কারটার আমেরিকাকে বিক্রি করে দিয়েছেন।' নিকসন এবং ফোরডের অর্থসচিব উইলিয়ম সিমোনও একই কথা বলেছিলেন, 'আমাদের জীবৎকালে কারটার প্রশাসন ইতিহাসের নিকৃষ্টতম পথিকৃৎ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।'

একথার প্রমাণ দেখাতে গিয়ে রেগানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারি বেড়েছে দ্বিগুণ। ১৯৭৬ সালে ছিল শতকরা ১২ ভাগ। এখন তা দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৪ ভাগ।

ব্যর্থতা ছিল কারটারের শিরোভূষণ। মুদ্রাস্ফীতি তিনি বুঝতে পারেননি, শুধু তাই নয়, পরিষ্কার বলেছেন, 'মুদ্রাস্ফীতি আজকের দুনিয়ায় রোখা যায় না।' তাছাড়া ইরাণের হাতে বন্দী কূটনীতিবিদদের তিনি উদ্ধার করতে পারেননি এবং ডেট্রএটের কারখানায় ধর্মঘট ও ছাঁটাই তিনি সামাল দিতে পারেননি।

তাহলে অ্যামেরিকা কি এবার রেগানের নেতৃত্বে সেই সুবর্ণযুগে ফিরে যাবে ? রেগান ও তাঁর দলবল তারস্বরে এ দাবি করলেও খোদ অ্যামেরিকাতেই সেকথা বিশ্বাস করার লোক খুবই কম। মনে রাখতে হবে পতন শুরু হয়েছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর থেকেই এবং একথাও মনে রাখতে হবে চূড়ান্ত সৌভাগ্যের ক্লান্তি একটা থাকবেই। বিশেষত যে সৌভাগ্য অন্য দেশগুলির দ্বারা পুষ্ট।

জিমি কারটার যখন প্রথম মার্কিন প্রেসিডেনট হয়েছিলেন তখন ছিলেন একজন 'বাদামঅলা'। কিন্তু তাঁর আমলেই ক্যামপ ডেভিড চুক্তি হয়েছে, চীনের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তৈরি হয় সলট ২ চুক্তি। রেগান এ সমস্ত কিছুরই বিরুদ্ধে। তিনি চান না তাইওয়ানকে হেলাফেলা করে চীনকে বুকে টানা হোক। কিন্তু কারটার চাইতেন না অন্য দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করুক। রেগান সোচ্চারে তা চান। তিনি চান ইসরায়েলের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যা যা করা দরকার সর্বকিছুই করতে হবে এবং অত্যন্ত সরলভাবেই স্বীকার করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক দিক থেকে এক নম্বর শক্তিতে রূপান্তরিত করাই তাঁর ভবিষ্যৎ লক্ষ্য। রেগানের মতে, অ্যামেরিকা দানসত্র খুলে বসেনি। যে দেশ অ্যামেরিকার স্বার্থ দেখবে অ্যামেরিকা শুধু তারই স্বার্থ দেখবে।

দেশের মধ্যে কারটার যে জন্যে সমালোচনার সামনে পড়েছিলেন তা হলো বেকারী বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত কর। রেগান চান ব্যবসায়ীদের যাবতীয় স্বার্থ থেকে সরকার তার হাত তুলে নেবে, চাকুরির সুযোগ বাড়াবে এবং শতকরা ৩০ ভাগ কর কমিয়ে দেবে। এর মধ্যে থাকবে গ্যাসোলিন, অশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস। কারটারের আমলে এসবের দাম বেড়েছিল অস্বাভাবিক রকমের।

সাধারণত বড় কোন রাষ্ট্রনৈতিক নেতা অতীতের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি করেন না। যে ভগ্নদশা থেকে কারটার একটি তাসের মিনার গড়তে চেয়েছিলেন, রেগান সম্ভবত এক ঝটকায় তা ভেঙে দিয়ে আরও বড় একটি বালির দুর্গ বানাতে চান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যে পথে চলতে চেয়েছিল নিকসন তার সর্বতোব্যর্থতা প্রমাণ করে দিয়েছেন, রেগান সেই নিকসনী পথকে এখনও ঠিক বলেই মনে করতে চান। কেন এমন আশংকা ?

সাধারণত এতদিন ধরে দুই দলীয় শাসন ব্যবস্থাই অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসছে। কিন্তু এবারের নির্বাচনে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। এবারে দুজন নির্বাচন প্রার্থী নন, রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হয়েছিলেন আরও একজন, তিনি সামান্য একজন মুদির ছেলে জন অ্যানডারসন। অ্যানডারসনও নির্বাচনী সভাগুলিতে প্রচুর লোক টেনেছিলেন।

অ্যানডারসন কারটারের মতই মনে করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৈত্রী অবশ্যম্ভাবী, তিনি মনে করেন প্যালেসটিনিয়দের স্বার্থ বুঝতে হবে এবং তাদের দাবি মানতে হবে, তিনি মনে করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সব দেশের কাছেই যেতে হবে প্রভু হিসাবে নয়, বন্ধু ও সহমর্মী হিসাবে এবং সর্বোপরি তিনি মনে করেন কোনরকম পারমাণবিক ক্ষমতাদ্বন্দ্বে তাঁর দেশের জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না।

এদিক দিয়ে কারটার ও অ্যানডারসন অনেক কাছাকাছি মনের মানুষ। এই দু'জন যদি পৃথকভাবে না দাঁড়িয়ে সমবেতভাবে রেগানের বিরোধিতা করতেন তবে ভোটের ফলাফল অন্যরকম হত কিনা বলা যায় না। তার কারণও খুঁজতে হবে মার্কিন ভোটারদের মর্জির মধ্যে। ভোটাররা চাইছেন অন্য কিছু, অন্য কোনরকমের সরকার। অ্যানডারসন সেই 'অন্যরকম কিছুর' প্রতীক হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন। তার ওপর এবারের মার্কিন নির্বাচনে ভোট পড়েছে অস্বাভাবিক রকমের কম। শতকরা ৫২.৩ ভাগের কাছাকাছি। ট্রুম্যান-ডিউইর নির্বাচনী দ্বন্দ্বে পড়েছিল শতকরা ৫১.১ ভাগ। তারপর অনেকদিন এত কম ভোট পড়েনি। তারমধ্যে শতকরা ৭ ভাগ ভোটই নিয়ে চলে গেছেন অ্যানডারসন কোনরকম দলীয় শক্তি ছাড়াই। এই অ্যান-



বিজয়ী রেগান



শ্রী ন্যান্সি ও রেগান

ডারসন-সমর্থক এবং ভোট না দেওয়া অন্য নাগরিকদের মনোভাব যে রেগানের অনুকূলে যাবে না সেকথা পরিষ্কার করেই বলা যায়। তাছাড়া বেকারত্ব এবং করবৃদ্ধির সুদূরপ্রসারী ফলকে সামাল দেওয়া চার বছরের মেয়াদী কোন রাষ্ট্রপতির পক্ষেই সম্ভব নয়। বিশেষত ইওরোপে আজ আর মারকিন-বন্ধু কেউই নেই এবং নাটো আর সিয়াটো ভাঙতে ভাঙতে বিলুপ্তির পথে।

এরপরে আছে ঘর সামলানোর প্রশ্ন। রেগান কুখ্যাত মারকিন বিদেশসচিব কিসিংজারকে আবার ফিরিয়ে আনতে চান। এটা দলের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। কনসারভেটিভ ককাসের ন্যাশনাল ডিরেকটর এবং রেগানের অন্যতম হিতাকাঙ্ক্ষী হাওয়ারড ফিলিপস বলেছেন, 'আমরা চাই না রেগান তৃতীয় রাষ্ট্রপতি হিসাবে কিসিংজারের হয়ে কাজ করুন।' কিসিংজার তার উত্তরে বলেছেন, 'আমি এখানে চাকরি খুঁজতে আসিনি।'

এই কনসারভেটিভ ককাস প্রথমে রেগানের কাছাকাছি আসতে চাইছিলেন না। পরে তারাই দলের দক্ষিণপন্থী হিসাবে রেগানের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে শুরু করেন। আপত্তি জানায় দলের মডারেটরা। এরাই রেগানের নির্বাচনী সভাগুলিতে রকেফেলারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকে। তাদের মতে রকেফেলার মৃত কিন্তু তাকে নির্বাচনী সভায় টেনে এনে ১৯৬৪-র আদর্শগত লড়াই আবার উসকে দেওয়া উচিত নয়।

শেষে কিসিংজার বক্তৃতা দিয়েছেন এবং রেগানের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'তিনিই আমাদের ভবিষ্যতের আশা।' যদিও তাঁর সঙ্গেও বিরোধ থেকে যাচ্ছে। কারটার এবং অ্যানডারসনের মত তিনিও মনে করেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশেষত চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতেই হবে।

ডেট্রএটের প্লাজা হোটেলে শ্রীমতী ন্যানসি রেগান এবং ছেলে মিখায়েল, রন ও মেয়ে প্যাট্রিসিয়া, মুরিনকে নিয়ে বসেছিলেন রেগান। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে জ্যাক কেমপ, জন কোনালি, ব্যারি গোলডওয়াটার এবং প্রাক্তন প্রেসিডেনট জেরালড ফোরড। অদূরে দরজার আড়ালে অর্ধেক মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হেনরি কিসিংজার। সবাই তারস্বরে নিন্দা করছেন জিমি কারটারের। ব্যর্থ তাঁর নেতৃত্ব, অযোগ্য তাঁর বিচার ব্যবস্থা এবং অতি সাধারণ তাঁর প্রশাসন। বিপরীতে রয়েছে একটি ভবিষ্যৎ। কী করতে চান রেগান, কেমন করে করতে চান। কর দর কমাতে চান, আমেরিকার হৃতগৌরব ফেরাতে চান, আরও চাকরির সুযোগ দিতে চান, আরও অস্ত্রশস্ত্র বানাতে চান।

কিন্তু পায়ের তলার বালি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে। টাইম পত্রিকা একবার একটা কারটুন দিয়েছিল: জনৈক মারকিন মস্তান কোমরে রিভলবার ঝুলিয়ে লম্বা হয়ে হেঁটে যাচ্ছে, মুখ ব্যাজার। আর তাকে যে দেখছে ভয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ছে। সাইনবোরডে কোথাও লেখা রয়েছে হেলমুট'স হোটেল, কোথাও ফ্রেনচিয়েন'স ড্যানস হল, কোথাও উড়ছে বৃটিশ পতাকা, কোথাও ইতালিয়ান পতাকা। কারটুনের নাম ছিল 'হাই নুন ফর অ্যামেরিকা'স অ্যালিস।'

রেগানের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীই সম্ভবত ঐদিকে চলে গিয়েছে। তিনি চান আবার প্রভুত্ব, ইওরোপ এশিয়ায়।

তেহরানের কোন অজ্ঞাত স্থানে রয়েছে কিছু জিম্মি দেশবাসী, কেমন করে তাদের উদ্ধার করা যাবে সে কথাটা এই নির্বাচনী সভাগুলিতে কেউ পরিষ্কার করে বলেননি। বলেননি তার কারণ কারটারের চেষ্টার পরিণতি তাঁরা দেখেছেন এই সেদিনই। আর এই মধ্যপ্রাচ্যেই লুকিয়ে রয়েছে গ্যাসোলিন আর তেলের দামবৃদ্ধির রহস্য, লুকিয়ে রয়েছে কারখানায় কারখানায় জোজারের কারচুপি। ★

এই জয় শুভ হবে তো ?

বিশেষ প্রতিনিধি

রেগন জিতেছেন। অনেকেরই প্রশ্ন; তাঁর পক্ষে এই জয় শুভ হবে তো? ওদের দ্বিধার মূল কারণ রেগনের জয়ের বছর শূন্য দিয়ে শেষ। এটা নাকি মারকিন প্রেসিডেনটের পক্ষে মোটেই শুভ চিহ্ন নয়। সেই ১৮৪০ সাল থেকেই দেখা গেছে—যে সব প্রেসিডেনট শূন্য বছরে (অর্থাৎ ১৮৪০, ১৯২০, ১৯৬০ এই রকম বছরে) জিতেছেন তাঁরা শান্তিতে পুরো মেয়াদ কাটাতে পারেননি। তাঁদের কেউ কর্মরত অবস্থায় মারা গেছেন, কেউ বা হয়েছেন নিহত। ১৮৪০ থেকে এ পর্যন্ত শূন্য বছরে জয়ী প্রেসিডেনটের মধ্যে চারজন নিহত হয়েছেন, মেয়াদ পূর্ণ হবার আগে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন আরো তিনজন। জ্যোতিষীরা তাই রেগনের ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবিত। হয়ত সবটাই কুসংস্কার; কিন্তু অনেকেই তা উড়িয়ে দিতে পারছেন না।

এবার বরং অতীতে ফেরা যাক। এই জয়লাভ রেগনের পক্ষে শুভ তো?

১৮৪০ সালে উইলিয়ম হেনরি হ্যারিসন মারকিন প্রেসিডেনট নির্বাচিত হন। এক মাস কাজ করার পরেই তিনি নিউমোনিয়ায় মারা যান।

আব্রাহাম লিনকন নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৮৬০ সালে। ১৮৬৫-তে প্রেসিডেনট হিসেবে তিনি দ্বিতীয়বারের মেয়াদ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই নিহত হন।

১৮৮০-তে নির্বাচিত হন জেমস গারফিলড। তাঁর প্রশাসনে একটি লোক চাকরির চেয়ে ব্যর্থ হয়। সেই লোকটিই গারফিলডকে খুন করে।

মারকিন প্রেসিডেনট উইলিয়ম ম্যাককিনলের ভাগ্যও ভালো ছিল না। ১৯০০ সালে তিনি নির্বাচিত হন। নিহত হন ১৯০১-এ। ১৯২০ সালে নির্বাচিত হয়েছিলেন ওয়ারেন হারডিং। আলাসকা থেকে ওয়াশিংটন ফেরবার পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। মারা যান সান ফ্রানসিসকোয়।

১৯৪০-এ তৃতীয় বারের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ফ্রাংকলিন রুজভেলট। ১৯৪৪-এ তিনি মারা যান। তখন তিনি চতুর্থবার মারকিন প্রেসিডেনট। নতুন নিয়মে অবশ্য দুটি মেয়াদের বেশি কেউ মারকিন প্রেসিডেনট নির্বাচিত হতে পারেন না।

১৯৬০-এ নির্বাচিত হয়েছিলেন জন কেনেডি। ১৯৬৩ সালের ২২ নভেমবর তিনি ডালাসে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে কনিষ্ঠ প্রেসিডেনট কেনেডির মৃত্যুতে সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। দেশে দেশে নেমে এসেছিল শোকের ছায়া। লিনকনের হত্যাকাণ্ডও এভাবে পৃথিবীকে নাড়া দিয়েছিল।

১৯৮০-তে নির্বাচিত হলেন রেগন। ৬৯ বছর বয়সে তিনিই মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেনট। প্রেসিডেনটের দায়িত্ব নেবার ১৭ দিন পর তিনি সত্তরের কোঠায় পা দিচ্ছেন। কিন্তু বয়স তাঁর কর্মশক্তি ও মনোবল কোনটার ওপরেই কোন ছাপ ফেলতে পারেনি। ১৯৬৮ এবং ১৯৭৬ সালে তিনি প্রেসিডেনট পদে দু-দুবার রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন চেয়েছিলেন। রিপাবলিকান দল অবশ্য তাঁকে প্রার্থী দাঁড় করায়নি। তাতেও কিন্তু রেগন দমে যাননি। এবার তিনি দলের মনোনয়ন তো পেলেনই, সেই সঙ্গে জিতেও গেলেন। প্রমাণ করলেন, মনোবল থাকলে মানুষ যদি আন্তরিকভাবে কিছু চায় তাহলে তা সে পাবেই। ★


পশমের ফুরফুরে নরম ভাব
পশমের জামাকাপড়ের যত্ন এমন
জেণ্টীল সেগুলি রেখেছে যেমন
মূল্যবান পশমের জামাকাপড় কেবল শীতের মরশুমেই পরা হয়। এগুলি যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য ধোয়ার সময় বিশেষ যত্ন নিতে হয়। আর সেইকারণেই আপনার চাই—জেণ্টীল। কোমল কাপড়ের ধোয়ার জন্যে বিশেষ ভাবে বানানো কেবল একটাই লিকুইড ডিটারজেন্ট, যা পশমের জামাকাপড়ের কিছুমাত্র ক্ষতি না করে পরিস্কার, উজ্জ্বল করে ধোয়।
genteel
LIQUID WASHING DETERGENT
THE SAFEST HOME WASH FOR DELICATE CLOTHES
জেণ্টীল
নরম জামাকাপড় সবচেয়ে নিরাপদে বাড়িতে ধোয়ার জন্যে
SHILPI-DM 36/80 BEN.

রাজ্যে রাজ্যে

ছেলেধরা খুঁজতে সারা জেলা উজোড়

বাস রাস্তা কোন পথে পড়বে বাবা বলতে পারো।' ভয়চকিত শিশুর দল যে দিকে পারল ছুট লাগাল। খবর রটে গেল ছেলেধরা এসেছে, ছেলেধরা। লোকজন জুটে যেতে দেরি হল না। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক এই প্রৌঢ়াকে তখন চারদিক থেকে নানা প্রশ্ন করা হতে লাগল। কিন্তু উত্তর দেবে কি, সে তো ভ্যাবাচাকা খেয়েই অস্থির।

লোকজনের সন্দেহ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। এ মেয়েছেলেটা নির্ঘাৎ ছেলেধরা। টানতে টানতে তাকে নিয়ে চলল থানায়। পথে ছেলেধরার নামে আরও লোক জুটে গেল। প্রায় শ' পাঁচেক লোক এরপর আর থানায় নিয়ে যাবারও দরকার মনে করল না। বুড়িকে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলল। পরে তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল।

এরকম ঘটনা একটা নয়। তামিলনাড়ু সালেম জেলায় মৃত্যুর এই তাণ্ডব চলেছিল কয়েক মাস ধরে।

সেপটেম্বর মাসে দাদামপাতি গ্রামে ৩৫ বছর বয়সের এক চাষীবউকে পুড়িয়ে মারা হয় ছেলেধরা সন্দেহে। লোকজন হঠাৎ লক্ষ করল এক নারকেল গাছের ছায়ায় চাষীবউটি একা বসে আছে। আর যায় কোথায়। 'কে তুমি, কোথেকে আসছ, ছেলেধরা নাকি



যাবে কোন বাগে' ইত্যাকার নানা প্রশ্ন। প্রশ্ন যত বাড়ে, লোকজনও তত বাড়ে। বউ-এর মুখে তবু রা সরে না।

তাহলে এ তো নির্ঘাৎ ছেলেধরা। তবে আর কি, পুড়িয়ে মার ওকে। চাঁদা তোলা হল। সেই টাকা নিয়ে বাইশ বছরের ছোকরা গোবিন্দন ছুটল কেরোসিন আনতে। গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেবার পর চাষীবউ-এর গায়ে দেশলাই কাঠিটি জ্বেলে দিয়েছিল নাকি নটেশন। বয়স তার তেত্রিশের মতন। বেচারি নটেশন এখন আমমাপেত পুলিশ হাজতে লপসি খাচ্ছে।

নটেশনের মতন ধরা পড়েছে আরও তেরোজন।

কিন্তু ঘটনাটা কি? পুলিশের অ্যাসিস-ট্যানস সুপারিনটেনডেনট শ্রীমতী লতিকা সারণ জানিয়েছেন, একেবারে বাজে ব্যাপার। একটাও ছেলে পুরো সালেম জেলার কোথাও খোয়া যায়নি। মাঝে মধ্যে হারায় বটে কিন্তু আবার ফেরৎ পাওয়া যায়। তবে সারা সালেম জেলায় একটা ছেলেধরার দল ঘোরা-ঘুরি করছে এটা গাঁজাখুরি গল্প ছাড়া কিছুই নয়। ★

জেলায় জেলায়

হামিলটনগঞ্জ—জয়ন্তী স্টেশন থেকে হাওদা পর্যন্ত যে রেললাইন এতদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল আজ তা উধাও। ৩৫ টন ওজনের রেললাইন যার বাজার দর আনুমানিক ৮৭ হাজার টাকা—রাতারাতি কিভাবে যে উধাও হল প্রশাসনের কাছে তা নাকি বিস্ময়ের ব্যাপার। অথচ পুলিশ মহল পরিষ্কার জানতেন কখন, কিভাবে ৮৭ হাজার টাকার রেললাইন চুরি গেল এবং কোথায় কার কাছে বিক্রি হলো। (হিমাচল বার্তা/শিলিগুড়ি)

মুর্শিদাবাদের প্রধান এবং মূল্যবান নবাব প্যালেস বা হাজার দুয়ারীর ছাদ ফেটে বৃষ্টির জল ঝরছে। শ্বেতপাথরের টালি উঠে যাচ্ছে। কোটি টাকা মূল্যের অয়েল পেনটিংগুলি ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেখবার কেউ নেই, সারাবার কেউ নেই। জাতীয় সংগ্রহশালার সম্মান প্রাপ্যের অধিকারীর দাবিদার এই হাজারদুয়ারী কি তাহলে সরকারের উদাসীনতায় নষ্ট হয়ে যাবে?

(মুর্শিদাবাদ সন্দেশ/মুর্শিদাবাদ)

বাসন্তী থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের সনাতন পাইক এবং তার ছেলে সমরের একই সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়। ছেলেটিকে কামড়ে চলে যাবার সময় কি সাপ দেখতে গিয়ে বাবা সাপের লেজ ধরে টানেন। ফলে পাল্টা কামড় এবং এই সর্বনাশা পরিণতি। মূর্তিমান কাল হলো এক দুরন্ত কেউটে।

(সুন্দরবন সমাচার)

এই দুর্মূল্যের বাজারে, যখন সব জিনিসেরই দাম ক্রমশই বাড়ছে তখন আমাদের পশ্চিম বাংলাতেই দশ পয়সা দিয়ে দিব্যি সুখে ট্রেন ভ্রমণ করা যায়। বিশ্বাস না হলে আসুন হুগলী জেলার হরিপাল বা নালিকুল স্টেশনে। অনায়াসেই পার হতে পারবেন। কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না। তবে কি, সেখানে টিকিট চেকার নেই? নিশ্চয়ই আছে। তবে টিকিটের জন্য মোটেই নাছোড়বান্দা নন। চেকার পেরিয়েই একজন কুলির দর্শন মিলবে। তার প্রসারিত হস্তে দক্ষিণা দশ পয়সা সঠিক



পড়ল কিনা সেদিকে অবশ্য তার সজাগ দৃষ্টি আছে। তা দিনে মন্দ আয় হয় না। জনকল্যাণে এ হেন কার্যকলাপ সত্যিই প্রশংসনীয়। (ডেলি প্যাসেনজার/হুগলী)

চাকদহ বেলডাঙ্গার শ্রীমতী লতিকা অধিকারী কল্যাণী নেহরু হাসপাতালে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। তার স্বামী বদ্রীনারায়ণ অধিকারী কল্যাণী নোটিফায়েড গিয়ে পুত্রের বার্থ-সারটিফিকেট চাইলে তাকে যে সারটিফিকেট দেওয়া হয় তাতে পুত্রের বদলে কন্যার উল্লেখ থাকায় বদ্রী অধিকারী 'থ'। জলজ্যান্ত তিন বছরের পুত্র সন্তান বাড়িতে বহাল তবিয়তে অথচ সারটিফিকেট নিতে হচ্ছে কন্যার। বদ্রী অধিকারী এই ভৌতিক কাণ্ডের জবাবদিহি চাইলে নোটিফায়েড কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল থেকে প্রেরিত কাগজপত্র দেখান। সেই কাগজপত্রের সর্বত্রই কন্যার উল্লেখ থাকায় সকলেরই চক্ষু স্থির।

(চ্যালেঞ্জ/রানাঘাট)

বহরমপুর থেকে জনৈকা আত্মীয়া কুরুম গ্রামের মনসা মণ্ডলকে চিঠি দেন, গ্রামের বামুনপুকুরে যে ছাগলটি জলে ডুবে মারা যাবে তাকে যেন কুরুমগ্রামের রক্ষাকালীতলায় সমাধি দেওয়া হয়। পূর্ব ঘোষিত ঘটনাটি হুবহু ঘটে গেলে গ্রামবাসীদের মনে যথেষ্ট কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। (দিদিভাই/বীরভূম)

ছবি এঁকেছেন : নিতাই ঘোষ



ডানহাত পঙ্গু এক তরুণী বামহাতে লেখার কাজ করছে

পনর বৎসরের কিশোর—অথচ নিজে কিছুই করতে পারে না। চিৎকার করে সারাক্ষণ। এটা ফেলে, ওটা ভাঙে। বাচ্চারা ভয় পায়। তাতে ওর আরো রাগ। কামড়ে, খামচে ফেলে দেয়। লোকে বিরক্ত হয়, সন্ত্রস্ত হয়। নিরুপায় বাবা-মা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখেন ছেলেকে। ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে শিউরে ওঠা ছাড়া তাদের কোনো উপায় নেই।

ন'-দশ বছর পরের কথা। সেই কিশোর এখন চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক। ঋজুদেহে আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ স্পষ্ট। সহাস্য অভিবাদনে নম্র। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির পুরস্কার নিয়ে এসেছে কাপড়-কাটায় ও অন্যান্য হাতের কাজে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে। জড়ানো উচ্চারণে কিন্তু ছোট ছোট সুগঠিত বাক্যে জানালো—সে ঝোলা তৈরি করতে পারে, পাটের ফেঁসো দিয়ে ঝুড়িও তৈরি করতে পারে। শারটের কাপড় কেটে হপ্তায় পঞ্চান্ন টাকা রোজগার করে। সেই টাকা জমিয়ে সে বালিগঞ্জে একটা দর্জির দোকান করবে, সেখানে তার মতো আরও কয়েকজন কাজ করবে, রোজগার করবে, স্বপ্ন দেখবে। এই হলো শান্তনু হালদারের বড় হবার কাহিনী। রানী রাসমণির বাড়ির ছেলে শান্তনু প্রমাণ করেছে—মানুষ সব কিছুই পারে, এমন কি বুদ্ধির জড়তাও কাটাতে পারে—সম্পূর্ণ না হলেও অংশত। এর পেছনে আছে তার নিজের এবং অলকেন্দু-বোধ-নিকেতনের অনলস প্রয়াস।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে শান্তনুরা বড়জোর কয়েকজন। বিশ্ব জুড়ে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী-বর্ষের প্রস্তুতি চলেছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে ভারতে কী কাজকর্ম হয়েছে তা একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন।

প্রতিবন্ধীরা দু' রকম—শারীরিক প্রতিবন্ধী ও মানসিক জড়বুদ্ধি।

শারীরিক প্রতিবন্ধী অর্থাৎ অন্ধ, বধির ও মূকদের নিয়ে ভাবনা-চিন্তা হচ্ছে, বিভিন্ন কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়েছে সরকারের এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণ সংস্থার তরফ থেকে। মানসিক জড়বুদ্ধিদের অসহায়তা শারীরিক প্রতিবন্ধীদের চেয়ে বহুগুণে তীব্র ও দুরতিক্রম্য। ওদের সমস্যা কতটা সচেতনতা বা ভাবনা-চিন্তা জাগিয়েছে দেখা যাক।

১৯৫১ খৃস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল 'বোধিপীঠ' কলকাতার রাজাবাজারের কাছে। কিন্তু বিশেষত আর্থিক আনুকূল্যের অভাবে প্রতিষ্ঠানটির প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রসারলাভ করতে পারেনি। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাদের নিয়োগ করবার বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা রেখা ঘোষ

প্রতিবন্ধীদেরও বিয়ে দেওয়া সম্ভব, দরকারও

সুতনুকা বাগচী

জানালেন, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রই সরকারের অনুমোদন নিয়ে আসে, সরকার মাথাপিছু ৮০ টাকা করে দেন, তার মধ্যে বেড, খাওয়া দাওয়া এবং অন্যান্য খরচ চালিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন দিতে হয়। ছাত্র সংখ্যা আগে ছিল ৭৫ বর্তমানে ৯০-তে দাঁড়িয়েছে। কিছু ছাত্রছাত্রী বাবা-মার খরচে আসে। তাদের ব্যাপারে প্রাথমিক শ্রেণী বিভাগ করে একেবারে জড়ধীদের (profoundly retarded) তাঁরা বাতিল করেন। সরকার অনুমোদিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অবশ্য তা করতে পারেন না। প্রতিষ্ঠানটি মূলত আবাসিক। বাড়িটি মলিন, জীর্ণ, ছাত্রছাত্রীদের অবস্থাও সেরকম। সম্পাদিকা অসহায় বোধ করেন। তবে সল্ট লেকে বাড়ি তৈরির জন্য সরকার জমি দিয়েছেন, আশা করছেন স্কুলটা এবার আরও ভালো হবে।

মানসিক জড়বুদ্ধিদের নিয়ে গবেষণা বা এদের সুস্থ সামাজিক জীবন দেবার প্রশ্নটি স্পষ্ট আকার নেয় ১৯৫৬ সালে। ডাঃ বি এন রায় এ ব্যাপারে অগ্রণী। ১৯৬০ সালে বলতে গেলে তাঁরই ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় অলকেন্দু-বোধ-নিকেতন। আজ এটি পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য



তিন প্রতিবন্ধী তরুণ

তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রতি বছর বিশেষ অনুদান পান।

মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণ কী কী, এদের কিভাবে ভাগ করা হবে—এসব প্রশ্ন নিয়ে ভারতে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন ডাঃ অজিত দেব। ডাঃ দেবের মতে তিন রকম কারণে মানসিক প্রতিবন্ধী জন্মাতে পারে—(১) প্রাথমিক বা বংশগত কারণ, (২) পরিবেশগত কারণ অর্থাৎ গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং শিশুর জন্মোত্তর অবস্থার জটিলতা, (৩) অল্প বয়সে উদরাময়, আমাশয় এবং প্রোটিনের অভাব—একে সামাজিক কারণ বলা যায়। ডাঃ রায়ের মতে বংশগত কারণে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা কম। দেহকোষে ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতার ফলে মঙ্গোল শিশুর জন্ম হয়। এর প্রধান কারণ বেশি বয়সে সন্তান হওয়া। কম বয়সী মায়েরও মঙ্গোল শিশু হয়, তবে খুবই কম। ডাঃ দেব ভ্রূণের শরীরে বিশেষ জৈব রসায়নের (Enzyme ইত্যাদি) অভাবও প্রতিবন্ধকতার অন্যতম কারণ বলে মনে করেন। এছাড়া যৌন রোগসম্পন্ন অর্থাৎ সিফিলিটিক পিতামাতার সন্তানেরও জড়বুদ্ধি হবার সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

শিশুর গর্ভকালীন অবস্থা, প্রসবকালীন এবং জন্মোত্তর অবস্থা শিশুর সুস্থ মস্তিষ্ক গঠনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভকালীন অবস্থায় সংক্রামক রোগ, অ্যানটি-বায়োটিক জাতীয় কড়া ওষুধ খাওয়া, শরীরে রঞ্জনরশ্মির প্রয়োগ, হাম, মায়ের শরীরে প্রোটিনের অভাব, পেটে ধাক্কা লাগা, মানসিক দুশ্চিন্তা, উত্তেজনা, অত্যাধুনিকা মহিলাদের ক্ষেত্রে ধূমপান ও মদ্যপান ভ্রূণের মস্তিষ্ক দুর্বল ও বিকৃত করে। প্রসবের সময়ে শিশুর মাথায় আঘাত লাগলে,

ডাক্তার বা নারসদের অনবধানতাবশত অবহেলা, জন্মকালীন পাণ্ডুরোগ (Jaundice), Oxygen অত্যধিক বেশি দেওয়ার ফলে, হঠাৎ খুব জ্বর উঠলে, অথবা অপরিণত (premature) অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হলে জাতকের বুদ্ধি অনুন্নত হবার সম্ভাবনা থাকে। জন্মগ্রহণের পর মেনিনজাইটিস বা এনকেফেলাইটিস হলে কিংবা বারবার মৃগীর আক্রমণ হলেও শিশুর অল্প বুদ্ধি হবার সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয় কারণটি অর্থাৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণটি ভারতের মত দরিদ্র দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অল্প বয়সে উদরাময়, আমাশয় এবং পুষ্টির অভাব শিশুর স্নায়ুকোষকে দুর্বল করে। এ-জন্য অনেক ছেলেমেয়ে হলে শেষের সন্তানদের মধ্যে মানসিক অপরিণতির আশংকা প্রবল।

ডাঃ দেব স্বীকার করেছেন ঃ এভাবে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেলেও, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সঠিক কারণ আলাদাভাবে পাওয়া যায় না, অথবা পাওয়া গেলেও এড়ানো যায় না। ডাঃ রায় জানান, ভারতে মানসিক প্রতিবন্ধীর সংখ্যা দু-কোটির কাছাকাছি। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই আঠার লক্ষ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে এটি একটি ভীতিজনক সংখ্যা। প্রথমত, উপযুক্ত শিক্ষা না পেলে এরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না এবং আর্থিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করবে পিতামাতা ও অন্যান্য পরিজনের ওপর। এদের শিক্ষা দেবার প্রতিষ্ঠানও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। ডাঃ রায় বললেন—তিনি বিভিন্ন প্রদেশে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, সাড়াও পেয়েছেন। আসাম, মেঘালয়, বিহার ও উড়িষ্যায় এরকম কোনো প্রতিষ্ঠান আদৌ নেই। রাঁচিতে একটি বিদ্যালয় খোলার কথা ভাবা হচ্ছে।


দুই প্রতিবন্ধী তরুণী, দেখলে বোঝার উপায় নেই যে এরা খোঁড়া

যদি বা উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে এদের উপার্জনক্ষম করা যায়; এদের সুস্থ যৌন জীবন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা এদেশে নেই। অথচ এদেরও তো যৌন চাহিদা আছে এবং তা যথাযথ না মিটলে নতুন বিকৃতি ঘটতে পারে। ডাঃ রায় বললেন, বিদেশে এদের স্বাধীন যৌন জীবনযাপন করতে দেওয়া হয়। স্বাভাবিক মানুষদের মত। আমাদের দেশে তা সম্ভব নয়, কিন্তু এদের বিবাহ দেওয়া সম্ভব। তবে তার জন্য বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। এদের চালনা করার জন্য, সংসার যাত্রা নির্বাহের ব্যাপারে ও অন্যান্য বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার জন্য Marriage Guidance Clinic গঠন করা প্রয়োজন, যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে। এতে থাকবেন বিশেষজ্ঞরা।

এদের ছেলেমেয়েও কি অস্বাভাবিক হবে? ডাঃ রায়ের মতে তার কোনো মানে নেই। অস্বাভাবিক বাবা-মার স্বাভাবিক ছেলে হয়েছে —এমন দৃষ্টান্ত আছে। তবে অস্বাভাবিক পিতামাতার কাছে থাকলে শিশুর আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে, এজন্য শিশুকে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মধ্যে রেখে পালন করা উচিত।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবন্ধীদের জন্য পাঁচটি বিদ্যালয় আছে—অলকেন্দু-বোধ-নিকেতন, বোধিপীঠ, যোধপুর পারকে আশুতোষ ইনসটিটুশন, আনোয়ার শা রোডে Institute of Educational Psychology and Research এবং চন্দননগরে প্রবর্ত্তক আশ্রম পরিচালিত স্কুল। এদের পারস্পরিক সমঝোতা নেই। অন্যেরা কিভাবে কাজ করছেন বা ঠিক কি পদ্ধতিতে কাজ করা উচিত—এ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনার কোনো আগ্রহ তাদের নেই। একটি প্রতিষ্ঠান আর একটির কাজকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, কিছুটা অনাস্থাশীল।

ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলির থেকে চোখ ফিরিয়ে এবার সরকারের দিকে তাকানো যাক। মানসিক প্রতিবন্ধী সমস্যাটি অন্যান্য প্রতিবন্ধী সমস্যার চেয়ে জটিল এই কারণে যে অন্যান্য প্রতিবন্ধীরা স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা পেতে পারে, সাধারণ স্কুলে তাদের পড়ানো যায়। কিন্তু মানসিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে আলাদা স্কুলের দরকার তো বটেই, অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা দরকার। তিন কি চারজন প্রতিবন্ধী পিছু একজন করে শিক্ষক দরকার হয়। কিন্তু কিভাবে জড়বুদ্ধিদের চেনা যাবে? Institute of Educational Psychology and Research-এর ডাঃ অরুণ ঘোষের মতে প্রত্যেক সাধারণ স্কুলে ছোট ক্লাসে ভর্তি করার সময় একটি বুদ্ধি-সমীক্ষা হলে এ ব্যাপারে খানিকটা আলোকপাত হবে। এর জন্য বিশেষজ্ঞরা থাকবেন। সল্ট লেকে একটি সরকারী গবেষণাকেন্দ্র আছে, 'Children's Aid Bureau' নামে। সেখানে মানসিক প্রতিবন্ধী এবং অপরাধপ্রবণ শিশুদের নিয়েও নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়, গবেষণা হয়, কিন্তু তার কথা অনেকেই জানেন না।

বিশেষ প্রশিক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা (Technical Education Director) ডাঃ বিমলেন্দু সেন ও সমাজকল্যাণ অধিকর্তা শ্রীসলিলরঞ্জন ভৌমিক জানালেন—আজ অবধি কোনো সেনসাসে মানসিক প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা নিরূপণ করা হয়নি। এবার করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ডাঃ সেন জানালেন, 'সেনসাসের অনেক দেরী আছে বলে, আমরা স্বাধীনভাবে একটা সমীক্ষা করছি। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষে আমাদের বিশেষ কর্মসূচীর প্রথম অঙ্গ এটি'। জেলা শাসকদের বলা হয়েছে, তারা এ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করতে চাইলে সর্বপ্রকারের সাহায্য দেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রতিবছর ৪০ লাখ টাকা প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য দেওয়া হয়। তার অধিকাংশই খরচ হয় না। যেটুকু খরচ হয়, তার মোটা অংশ অন্ধদের জন্য ব্যয়িত হয়, মূক ও বধিরদের জন্য কিছুটা, মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সামান্যই দেওয়া হয়। যে প্রতিষ্ঠানগুলি সাহায্যের দাবি নিয়ে আসেন, তাদের প্রার্থনা অধিকাংশ সময়েই অযৌক্তিক হয়, জানালেন ডাঃ সেন। কখনও এরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকা চান। এবং কেউই sponsorship scheme-এর অধীনে আসতে চান না। কিন্তু নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরির পরিকল্পনা


এক বিকলাঙ্গ শিশু

নিয়ে আসেন না কেউই। 'আপনারা এই উদ্বৃত্ত টাকাটা দিয়ে নিজেরাই কিছু করেন না কেন?' এ প্রশ্নের উত্তরে মৃদু হেসে ডাঃ সেন বললেন, 'তা করতে গেলে সমাজকল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে আমাদের যে পরিমাণ সক্রিয় যোগাযোগ থাকা দরকার, তা নেই। সেটা সম্ভবও নয়, যেহেতু উভয়ের নিজস্ব কর্মক্ষেত্র এত বিস্তৃত ও জটিল যে এরকম একটি দুটি ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করা অসম্ভব। তাছাড়া প্রতিবন্ধী সমস্যা এমনই একটি সমস্যা বিশেষত মানসিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে, যেখানে উন্নয়নের ইচ্ছা বা মানবতাবোধটাই একমাত্র কথা নয়; সেখানে অনেক বেশি প্রয়োজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ, অভিজ্ঞ মনোচিকিৎসকের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। 'প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য একটি পৃথক অধিকার গঠন করা প্রয়োজন, যেখানে কর্মকর্তা হবেন কিছু অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ'।

জড়বুদ্ধিদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে সরকার কিছু ভাবছেন কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে সমাজকল্যাণ অধিকর্তা শ্রীভৌমিক বলেন, 'সেরকম কিছু ভাবনা-চিন্তা কোথায় হচ্ছে? মূক ও বধিরদের তাও কাজ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অন্ধদের এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়োগ করা খুবই মুশকিল।

প্রতিবন্ধীকতা, বিশেষত মানসিক প্রতিবন্ধকতা যে আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারের কাছে একটি লজ্জা ও সংকোচের ব্যাপার—এ বিষয়ে মনোচিকিৎসকরাও শ্রীভৌমিকের সঙ্গে একমত। ডাঃ অরুণ ঘোষের মতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসিক প্রতিবন্ধীর বাবা-মা স্বীকার করতে চান না, তাদের ছেলে বা মেয়ে আর পাঁচজন স্বাভাবিক বাচ্চার মত নয়। তারা চিকিৎসক দেখাতে দেরী করেন, লুকোতে চান। এর ফল খারাপ হয়, স্বাভাবিক বাচ্চাদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে তাদের বাচ্চা যে বাধাগুলির সম্মুখীন হয়, সেগুলি তার মানসিক শান্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তার বুদ্ধিরও অবনতি হয়। তাই বাবা-মার উচিত ছোটোবেলাতেই অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই বাচ্চাকে চিকিৎসক দেখানো।

তবে সবক্ষেত্রে যে পিতামাতাকে দায়ী করা চলে না এবং অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকরাই যে বাবা-মার কাছে সত্য গোপন করেন, তার প্রমাণ অলকেন্দু-বোধ-নিকেতনের ছাত্র সুদীপ্ত, টাবলু, উজ্জল। এদের প্রত্যেকের মেজাজ আলাদা, অস্বাভাবিকতার ধরন আলাদা। উজ্জল কথা বলতে পারে না ভালো করে, কিন্তু লোকজন ভালোবাসে, সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গ কামনা করে। শান্ত, নির্বিরোধী। মাঝে মাঝে মাকে বলে, 'এখানে দিয়েছ কেন আমাকে?' মা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না, তখন চুপ করে যায়। যখন উজ্জল ভূমিষ্ঠ হয়, কিছু বোঝা যায়নি।



প্রতিবন্ধীদের সেন্টারে এক মূক যুবক মেশিনে বসে কাজ করছে

উজ্জল মঙ্গোল নয়। কিন্তু মঙ্গোল শিশু টাবলুর ক্ষেত্রেও ডাক্তার কিছুই বলেননি। বছর দুয়েক বয়সেও যখন ছেলে হাঁটতে পারে না, কথা বলে না, মুখ দিয়ে লালা পড়ে, তখন তারা শিশু বিশেষজ্ঞর কাছে যান। ডাক্তার মাকে সরিয়ে দিয়ে সত্য উদ্ঘাটন করেন। তারও তিন-চার মাস পরে মা জানতে পারলেন। সুদীপ্তও মঙ্গোল শিশু। ডাক্তার কিছুই বলেননি। বড় অস্থির। গান-বাজনা খুব ভালোবাসে। ড্রাম বাজাতে চায়, বাজাতে না দিলে চটে যায়, কেঁদে আকুল হয়। ইস্কুলে আসতে ওর ভালো লাগে না। এখানে কেউ কথা বলে না, ভালো করে



আর পাঁচজন তন্বী তরুণীর মতো দেখতে হলেও তরুণীটি কিন্তু বোবা

খেলতে পারে না। ডাঃ রায় আশ্বাস দিয়েছেন, ছেলের কথার জড়তা কিছুটা কাটবে, অস্থিরতা কমবে, টাকা পয়সা নেড়েচেড়ে খেতে পারবে, তাই এখানে দেওয়া। এদেরই প্রত্যেকেরই ভাই-বোনরা স্বাভাবিক। তারা ওদের খুব ভালোবাসে। ভালোবাসে প্রতিবেশীরাও।

কিন্তু ছবিটা সব সময়েই এমন নয়। এমন বহু শিশু আছে যাদের বাবা-মা ভাবতেই পারেন না—ছেলে তাদের স্কুলে যাবে, পড়বে, শুনবে। কোথাও নিয়ে গেলে তারা সদা সন্ত্রস্ত। ছেলের সঙ্গে যারা খেলে, তারা ওকে এলেবেলে করে দেয়, তখন ও, থুথু ছিটিয়ে, মেরে, ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। বাচ্চারা ওকে দেখে ভয় পায়, কেউ তাকিয়ে থাকে।

'যে কোন শিশুকেই তারা মূল অবস্থা থেকে উন্নীত করা যেতে পারে', ডাঃ রায় বলেন, 'একমাত্র severely retarded বা জড়ধী ছাড়া। এদের আমরা রাখি না—এদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এরা নিজেরা কিছুই করতে পারে না। কিছু শিখতেও পারে না। এদের পরে আছে অল্পবুদ্ধি যারা trainable, তারপর আছে trainable educable। প্রথম শ্রেণীকে সরল হাতের কাজ শেখানো যায়, লেখাপড়া শেখানো যায় না। দ্বিতীয় শ্রেণীকে অপেক্ষাকৃত জটিল হাতের কাজ এবং ক্লাস-ফাইভ-সিক্স পর্যন্ত লেখাপড়া শেখানো যায়, এরা বেয়ারা বা পিওনের কাজ করতে পারে। তবে স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা কেউই করতে পারে না। একটা মজার কথা হচ্ছে, এরা যে হাতের কাজগুলো শেখে, সাধারণের চেয়ে তা অনেক ভালোভাবে করতে পারে। এমনই এদের অভিনিবেশ এবং শেখবার ক্ষমতা।'

১৯৮১ সাল আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ হিসেবে পালিত হবে। সরকার কিভাবে এদের সুস্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠা দান করতে পারেন, সে সম্পর্কে ডাঃ অরুণ ঘোষের অভিমত, চিকিৎসার মাধ্যমে এদের উন্নত করে বুদ্ধি অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করে এবং হাতের কাজ সুচারুভাবে শিখিয়ে এদেরও সমাজের কাছে প্রয়োজনীয় করে তোলা যেতে পারে। এছাড়া, এই শিশুদের পিতামাতাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার তাদের বাচ্চার অস্বাভাবিকতার যথার্থ প্রকৃতি ও প্রতিকার সম্পর্কে, বাচ্চার অসুস্থতা গোপন করার কুফল সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন তো আছেই।' ডাঃ রায়ের মতে অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত বাবা-মারা এ ব্যাপারে শিক্ষিত বাবা-মার চেয়ে বেশি সহযোগিতা করেন, কেননা তাদের আত্মসচেতনতা অনেক কম। সমস্ত পরিকল্পনাটিতে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হবে, ভারতের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে তা যথেষ্টর বেশি হলেও একান্ত প্রয়োজনীয় এবং জাতীয় প্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ★

আলোকচিত্র : রাজীব বসু

ঘরোয়া

ঘরোয়া আসরে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে তবে সুখের কথা যে, বিতর্কের আসর এখনও তিক্ত ও ঝাঁঝালো হয়ে ওঠেনি। তবে উষ্ণতা কেবলই বাড়ছে। আসলে এবারকার বিতর্কের বিষয়টি আবেগের চেয়েও যুক্তি দাবি করছে বেশি। যুক্তির জাল যারাই বুনতে পারছেন না, তারাই মাথা গরম করে ফেলছেন। মনে রাখবেন, নিবারণ চক্রবর্তীর কাছে রক্তচাপ মাপার যন্ত্র নেই।

এবারকার চিঠিগুলির বক্তব্যের দিক সুন্দর সাজানো এবং তাতে যুক্তি, ও উদাহরণের বুলেট খুব খাপী। তার সঙ্গে যদি একটু ভাষার নকশি কাজ থাকতো! দুয়েকটা উপমার ফুল, একটা বা দুটো ধ্বনিগুঞ্জনের মধুকর!

আমাদের দেশে ভোট কিন্তু পুরুষ ও নারী দু'পক্ষই দেন। ঘরোয়া আসরে এখনও পর্যন্ত পৌঁছানো পঞ্চাশখানি চিঠির মধ্যে পত্রলেখিকার সংখ্যা মাত্রই পাঁচ। আশা করব, এই প্রারম্ভ শীতের তুহিন আক্রমণ তাদের কলমকে আড়ষ্ট করবে না। না কি তারা একেবারে সবেগে ও সদলে উন্মোচিত হবেন নববসন্তের বর্ণময় অভ্যাগমে?

পরিচালনা

নিবারণ চক্রবর্তী

পুঁথিগত নয়, রাজনৈতিক শিক্ষা চাই

'শিক্ষিত' কথাটাই আপেক্ষিক। সাধারণভাবে শিক্ষিত আমরা কাদের বলব? বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী যারা ডিঙিয়ে এসেছেন, তাদেরই কি আমরা শিক্ষিত বলব? হয়ত বলা যেতে পারে কিন্তু প্রসঙ্গ যেহেতু ভোটাধিকার অর্থাৎ রাজনৈতিক, অতএব সাধারণভাবেই প্রশ্ন উঠবে এইসব তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যে ক'জন রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত? লেনিনের একটা উক্তি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, 'জীবন ও রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষা মিথ্যা এবং ভণ্ডামি মাত্র।' জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষা আমাদের মনে সাধারণভাবে রাজনীতি সম্বন্ধে একটা উদাসীন ভাব বিস্তারে সাহায্য করে। তাই আমাদের শিক্ষিতদের রাজনীতি সম্বন্ধে ধারণা খুবই অস্বচ্ছ।

আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যে যে অংশ চাকুরিজীবী তারা আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায় করে থাকেন। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনকে এই অর্থনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম করার কোন চেষ্টাই এরা করেন না। তাই ভোট দেওয়াটা এদের কাছে একটা রুটিন ওয়ারক ছাড়া আর কিছু নয়।

শিক্ষিতদের আর একটা অংশ, যারা বেকার তারাও নির্বাচনী কার্য-সূচীতে চাকরি দেবার কথা যারা বেশি করে বলেন তাদেরই ভোট দেন। কিন্তু বর্তমান আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন না করে বেকার সমস্যার সমাধান অসম্ভব—এই রাজনৈতিক জ্ঞানটুকুও তাদের নেই।

শিক্ষিতদের এই রাজনৈতিক অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে আমাদের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতারা বৃথা আশ্বাস, কথার তুবড়ী দিয়ে একের পর এক নির্বাচনী বৈতরণী পার হচ্ছেন।

তাই শিক্ষিতদের ভোটাধিকার থাকা উচিত এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায় যে, শিক্ষিত আমরা তাদেরই বলব যার প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষা আছে। হয়ত দেখা যাবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী শিক্ষিতের ভোটাধিকার নেই যদিও নিরক্ষর চাষী মজদুরের ভোটাধিকার আছে অর্থাৎ একমাত্র রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিতদেরই ভোট দেবার অধিকার আছে।

নির্মলকুমার ঘোষ, কলকাতা ১

শিক্ষিতদের দাঁওপ্যাচ

'আমাদের দেশে শুধু শিক্ষিতদেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত' এই ভাবনাটাই অর্থহীন। দেশের শতকরা নব্বই জন ভোটারই অশিক্ষিত। অতএব, মাত্র দশ শতাংশ শিক্ষিত লোকের ভোট নিয়ে গণতন্ত্রের সংজ্ঞাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

অশিক্ষিত ভোটারদের নিয়ে যে সমস্যা তার মূলে কিন্তু শিক্ষিত সমাজ। আসুন যুক্তিতে···

(১) দেশ ও জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে দলের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে যারা গণতন্ত্রের মহিমাকে বিসর্জন দিয়ে থাকেন, সেই মহামান্য ভোটপ্রার্থীগণ কিন্তু বেশিরভাগই শিক্ষিত।

(২) মিটিং-এ প্রতিপক্ষ দলের নিন্দা মন্দ-গালিগালাজ তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে চৌদ্দ পুরুষের পিণ্ডি দিয়ে যারা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রাখেন সেই বক্তাগণ বিস্তু শিক্ষিত।

(৩) প্রতীক চিহ্ন নিয়েও হাস্যকর যুক্তি। যেমন—তুমি চাষী তোমার কাস্তে, তুমি শ্রমিক তোমার হাতুড়ি, তোমাদের পাশে যারা ধ্রুবতারার মত থাকবে তারাই 'কাস্তে হাতুড়ি তারা'—সি পি এম। তুমি চাষী কাস্তে হাতে কাটবে ধান, ঘরে তুলবে লক্ষ্মী তাইতো 'কাস্তে ধানের শীষ'—সি পি আই। তুমি চাষী, তোমার প্রথম প্রয়োজন লাঙ্গল। চাষ না করলে ফসল হবে কি করে। তাই 'লাঙ্গল কাঁধে চাষী'—জনতা। সব-মানলাম। তোমার যদি হাতই না থাকে তবে লাঙ্গলে চাষ, কাস্তে দিয়ে ধান কাটা হবেই না। আগে হাত পরে অন্য চিন্তা। তাই তোমাদের একমাত্র সহায় 'হাত'—কংগ্রেস (ই)। সহজ সরল অশিক্ষিতদের—এমনতর যুক্তি দিয়ে যারা ভোট ভিক্ষা করেন তারা কিন্তু শিক্ষিত।

(৪) 'টাকা দিয়ে বশ করা হয়'—অশিক্ষিতদের নিয়ে এ সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। আসলে কি তা ঘটে? ভোটের আগে প্রচারকারী শিক্ষিত কর্মীদের কাছে মিষ্টি সুরে দাদা-বৌদি বা কাকা-কাকী সম্বোধন অথবা এক-আধটা বিড়ি, খুব ভাগ্যবানেরা—সিগারেট বা বাজারের এক কাপ চা পেয়েই যে অপদার্থ দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষগুলো নিজেদের ধন্য মনে করে, তাদের ভাগ্যে কোটি কোটি টাকার ছিটেফোঁটাও পৌঁছায় না। আসল টাকা থাকে কিছু শিক্ষিত রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীর পকেটে।

(৫) গরিব ভূমিহীন চাষী বা শ্রমিক হলেই সি পি এম হতে হবে। সংখ্যালঘু অর্থই কংগ্রেস সমর্থক। ধনবান বা ব্যবসাদার হলেই কংগ্রেস হতে হবে'। এই মন্ত্রগুলো সাধারণ মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিয়ে বিচার-বুদ্ধির লোপ ঘটানোর পিছনে আছে শিক্ষিত সমাজ।

(৬) দেয়াল লিখনের পাশে বীভৎস ভয়ানক লোমশ রক্তমাখা কালো হাত অথবা উলঙ্গ নারীমূর্তির পাশে ধর্ষণে লিপ্ত পুরুষ মূর্তি অথবা মদ মেয়েছেলে নিয়ে বসে থাকা কোনও নেতা, ইত্যাদি চিত্রগুলির মাধ্যমে যারা মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করেন, ভোট দেবার ইচ্ছাকে ব্যাহত করেন তারা কিন্তু শিক্ষিত।

গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে শিক্ষিত সমাজের, নেতাদের, দলীয় কর্মীদের রুচির পরিবর্তন আনতে হবে। দেশের প্রত্যেক লোককে রাতারাতি শিক্ষিত করা কখনই সম্ভব নয়। ফলে শিক্ষিতদের নিয়ে শুধু ভোট হবে এ কল্পনা কোনও দিন বাস্তবে রূপ নেবে না। তাই দেয়াল লিখন, ভাষণ, প্রচার প্রভৃতিকে রুচিসম্পন্ন করে দেশবাসীকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমস্যার সমাধান করতেও পারেন 'শিক্ষিত সমাজ'। যারা অশিক্ষিত, হতভাগ্য, বঞ্চিত, দরিদ্র, দেশের ইতিহাস যারা জানে না, যারা নিজের গ্রাম বা দু-দশ মাইলের পরিধিকে ভারতবর্ষ মনে করে, তাদের নিজের অজান্তে ও বিনা দোষে একটা ভোট দেওয়ার মহান অধিকার থেকে দূরে রেখে গণতন্ত্র নামক মহান রাজসূয় যজ্ঞের আঙিনা থেকে বহিষ্কৃত করার ভাবনা যেন কেউ না ভাবে।

নিখিল তরফদার, রানাঘাট

মহমেডানের দিল্লি জয়ে কলকাতারই লাভ

শাক্যদেব

মহমেডান স্পোর্টিং দিল্লি জয় করেছে। আশি সালে মহমেডান একটা কিছু করুক—এটা অনেকেই চাচ্ছিলেন একান্তভাবে। চাচ্ছিলেন অগণিত মহমেডান সমর্থকদের মুখের দিকে চেয়ে। ওদেরও তো আশা আছে। পেতে ইচ্ছে ওদেরও তো হয়। অথচ কলকাতা ময়দানে দীর্ঘ ন'বছর ওরা বঞ্চিত। সেই সত্তরের গোড়ায় টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে হারিয়ে আই এফ এ শিলড পেয়েছিল মহমেডান। তারপর থেকে বারবার পুরনো বনেদী পরিবারের সুদিনের স্মৃতি মন্থন ছাড়া আর কী-ই বা পাবার ছিল ওদের? অনেকদিন করার মতো কিছুই করেনি মহমেডান। দিনে দিনে কালো-সাদা রং দুটির জেল্লা কমছিল। দীর্ঘ ন'বছরের মাথায় তা আবার জলজ্বল করে উঠেছে। বহু বছর বাদে প্রাসাদের কলি ফেরানো হলো যেন।

দীর্ঘ ষোল বছর পরে মহমেডান আবার ডি সি এম জয় করতে পারায় কলকাতা ময়দানের আশেপাশে আনন্দের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। কালো-সাদা পতাকায় ছয়লাপ চিৎপুর, ধর্মতলার অলিগলি, ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের মতো হরদম কোলাকুলি, তাঁবুতে আলোর বন্যা, মুখমিষ্টির ধুম।

ডি সি এম-এ এবার মহমেডান খেলেছে ঠিক বাদশার মতো। অথচ প্রথম থেকে তারা ফেবারিট ছিল না। ফেবারিট বলতে যা বোঝায় তার ভাগীদার ছিল স্থানীয়, জে সি টি, বিদেশী কোরিয় দল এবং এদেশী ইসটবেঙ্গল। এই তিনদলের মধ্যে মহমেডানের দিকে ছিল ব্যাংক অফ সিওল (কোরিয়া) এবং জে সি টি। অন্যদিকে ইসটবেঙ্গলের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ছিল বি এস এফ, গতবছর দারজিলিঙে গোলড কাপের খেলায় যারা হেলায় হারিয়েছিল ইসটবেঙ্গলকে তিন গোলে।

প্রথমেই হোঁচট খেয়েছিল মহমেডান। কোয়ারটার ফাইনাল লিগে ব্যাংক অফ সিওলের কাছে দাপটে খেলেও এক গোলে হেরে যায় মহমেডান। মুখে মুখে যখন বলাবলি শুরু হয়েছে, মনে মনে যখন ভাবা-ভাবি শুরু হচ্ছে মহমেডান সত্যিই কাগুজে বাঘ কিনা সেই সময়েই অমলরাজের দল জ্বলে ওঠে। রাজপথে হঠাৎ ওঠা ঘূর্ণিঝড় যেমন ধুলো-বালি, পোড়ো কাগজের টুকরোগুলোকে তালগোল পাকিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে, সেই তেজে মহমেডান খড়-কুটোর মতো ভাগিয়ে দিল হায়দরাবাদ একাদশ এবং জে সি টি-কে। দুটি খেলায় সাত গোল। সেমিফাইনালে উঠে আসে মহমেডান ব্যাংক অফ সিওলকে করুণা করে।

ওদিক দিয়ে বি এস এফ-কে সঙ্গী করে সেমিফাইনালে উঠে আসে ইসটবেঙ্গল। কলকাতার দুই ক্লাব কোয়ারটার ফাইনাল গ্রুপ লিগের চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় মহমেডানকে খেলতে হল বি এস এফ-এর সঙ্গে, ব্যাংক অফ সিওলের সঙ্গে ইসটবেঙ্গলকে।

সেমিফাইনাল খেলায় ইসটবেঙ্গলকে গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে ফাইনালে ওঠে ব্যাংক অফ সিওল। দু'বছরে দু'বার ইসটবেঙ্গল হারল তিন গোলে। হারল বাজে খেলে। একটা ধাঁধা আমার মাথায় ঢুকছে না কিছুতেই। কোচ পি কে ব্যানারজি ওই খেলায় হঠাৎই নাসির আমেদের ঘুম ভাঙিয়ে তাকে গোল প্রহরার কাজে লাগালেন কেন?

কলকাতার ঘরোয়া লিগ এবং ফেডারেশন কাপের শুরুতে নাসির আমেদই ছিল ইসট-বেঙ্গলের পয়লা নমবরের গোলরক্ষক। কিন্তু ফেডারেশন কাপের খেলায় মোহনবাগানের কাছে গোল খেয়ে নাসিরের কপাল পোড়ে। চটজলদি দলে চলে আসে দ্বিতীয় গোলরক্ষক দিলীপ পাল। তারপর থেকে দেখা গেছে অধিকাংশ খেলাতেই দিলীপ গোলরক্ষার কাজ-টুকু করে আসছে। লিগের সেই প্রাণঘাতী ফুটবলেও গোলে ছিল দিলীপ। তারপর দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির পর ডি সি এম ফুট-বলে অমিত গুহ এবং দিলীপ পাল ভাগাভাগি করে গোল আটকেছে। হঠাৎ তাদের ছেড়ে নাসিরকে ধরলেন কেন পি কে সেমিফাইনালের ওই গুরুত্বপূর্ণ খেলায়? পি কে যতই নিজের কোলে ঝোল টানার চেষ্টা করুন না কেন, তিনি যে ভুল করেছেন এবং তার মাশুল যে দলকে মারাত্মকভাবে দিতে হয়েছে—সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ কম। প্রশ্ন: পি কের ভুলটুকু কি ইচ্ছাকৃত?

ইসটবেঙ্গলকে তিন গোল দিয়ে ফাইনালে উঠে এসে ব্যাংক অফ সিওল হঠাৎই ফেবারিট হয়ে পড়ে। ওদিকে বি এস এফের প্রহরাকে ঠেলে ফেলে দুগোলে জিতে ফাইনালে আসে মহামেডান। মহামেডান সমর্থকদের হৃদ-স্পন্দনের গতি বাড়ে তখন থেকেই। পাবো কি পাবো পাবো না: আশা নিরাশার দোলা।

• • •

ফাইনাল শুরু হয় একটা ঝড়ের মধ্য দিয়ে। শুরু থেকেই গোটা মাঠের ইজারা নিয়ে নেয় যেন মহামেডান। স্টেডিয়ামের ক্রমাগত উল্লাসকে সঙ্গী করে আকবর, সাব্বির, দেবা-শিস, সুরজিত ব্যাংক অফ সিওলের দন্ত ভাঙতে বারবার কামড় মারতে শুরু করে। হাঁ হয়ে গোটা স্টেডিয়াম দেখে—এ যেন অন্য মহামেডান, ইতিহাসের ঘুম থেকে যে হঠাৎ জেগে উঠেছে। আক্রমণের জোয়ারে বারবার ফাটল ধরে কোরিয়দের বাঁধে। একের পর এক গোল মিস করে অবশেষে যখন সেই বহু ইপ্সিত বস্তুটির সন্ধান পাওয়া গেল, বিয়াল্লিশ মিনিট তখন কাবার হয়ে গেছে। তরুণ দেবাশিস রায় দেশের লক্ষ লক্ষ মহামেডান সমর্থকদের দিল বেঁচে থাকার নতুন প্রাণশক্তি।

দ্বিতীয়ার্ধে ব্যাংক অফ সিওল চেষ্টা করে-ছিল। পারেনি। পারেনি মহামেডানের দৃঢ়তায়। পারেনি গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলীর অসাধারণত্বে। বিশেষ কারোর নাম করলে কাউকে ছোট করা হয়। কৃতিত্ব গোটা দলটার, কৃতিত্ব কোচ অমল দত্তের, কৃতিত্বের ভাগ ক্লাবের পরিচালন কমিটির কর্তাব্যক্তিদেরও প্রাপ্য। এবং হয়ত সবার ওপরে আছেন তারা—দিনের পর দিন অনেক আশায় বুকে জমিয়ে যারা গ্যালারি উপচে দেন। এ বছরের মহা-মেডান ব্যক্তি বিশেষের ওপর নির্ভরশীল নয়। সমষ্টিগতভাবেই মহামেডান সেরার শিরোপা পেয়েছে।

ডি সি এম জিতে মহামেডান স্পোরটিং ভারতকে গর্বিত করেছে। মহামেডানের ডি সি এম জয়ে মাথা উঁচু হয়েছে বাংলার ফুটবলের। বাংলার ফুটবল যে এখনও ভারত শ্রেষ্ঠ তা আবার প্রমাণিত হল। কলকাতা ময়দানে এ যাবত একটা ধারণা চালু হয়ে গিয়েছিল, হাজার শক্তিধর হয়েও মহ-মেডান স্পোরটিং বড় কিছু নিতে পারবে না। ধারণাটি এরপর থেকে আর বিতর্কের পর্যায়ে রইল না। প্রমাণিত হল—মহামেডান মানে বিস্মৃতির তলানি মাত্র নয়। মহামেডান মানে সাতকাহন করে সেইসব রমরমা দিনের কাঁদুনি নয়। ক্লাব চালনা, দল গড়া এবং প্রেরণা জোগানোর যারা অন্যতম হোতা সেইসব কর্ম-কর্তা এই জয়ে খুশি। খুশি ভাস্কর, চিন্ময়, প্রশান্ত, সাব্বির, সুরজিতরা। সকলের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে ওরা প্রমাণ করল: ঘর ভাঙতে যেমন পারে গড়তেও ওরা তেমনই পটু। খুশি হাজার হাজার মহামেডান সমর্থক। ওদের চোখে মুখে এক অদ্ভুত তৃপ্তির ছাপ দীর্ঘ রোগভোগের পর ঘরবন্দী কিশোর সবুজ মাঠের বাতাস শরীরে মেখে যে তৃপ্তি পায়। এতদিনে 'ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা' নামকরণটির সার্থকতাটুকু প্রতিপন্ন হল। মহামেডানের প্রাপ্তিতে আখেরে কলকাতারই লাভ। প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিধিটা সত্যি সত্যিই এবার বাড়ল। ★

নীলরক্ত

প্রযোজনা: আলোড়ন নাট্যসংস্থা (চন্দননগর)। **রচনা:** উৎপল দত্ত। **নির্দেশনা:** রবীন মুখার্জি। **সুর:** স্বপন চ্যাটার্জি। **মঞ্চ:** ফ্রেন্ড ডেকরেটারস। **গানে:** রবীন মুখার্জি। **অভিনয়:** ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮০, নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির, চন্দননগর।

সামন্ত প্রভুদের মধ্যযুগীয় বর্বরতার নির্মম ছবি স্পষ্ট করে তোলার দায়িত্ব পালন করেছে আলোড়ন সংস্থা। নীলচাষ, চাষী, নীলকর সাহেব, অমানবিকতা এবং পরিণত পরিস্থিতিতে বিদ্রোহ ও বিদ্রোহী এসব নিয়েই 'নীলরক্তের' হৃৎপিণ্ড। যে উপাখ্যানের আশি ভাগই বঞ্চনার যন্ত্রণায় ভরা। নীল চাষী রক্তে-ঘামে ফসল বুনবে। প্রাপ্যটুকুর দাবি জানাতে গিয়ে পাবে বেত্রাঘাত। একদিকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রভুর চাবুক অন্যদিকে উপরি আবদারের ঢঙ, ঘরের বউকে সেবাদাসী পাঠাও। রক্তে অবাধ্যতার চিহ্ন এঁকে প্রতিবাদী মেঘাই সরদার ফাঁসীর মঞ্চে যাবার আগে তাই শেষবারের মত গর্জে ওঠে: 'আমাকে ফাঁস লটকাও ক্ষতি নেই। আমার যুগল এখনো জ্যান্ত।' মেঘাই সরদারের রূপসজ্জায় রমেন দে দরদ দেখিয়েছেন।

আন্তরিকতায় ভরা মূর্তিময়ী প্রতিবাদী যুগলমনির ভূমিকায় আরতি নন্দী আরেকবার মঞ্চে হাজির করতে চেয়েছেন মেঘাইকে। সায়েব-সুবোর খয়ের খাঁ হারাণ মিত্র স্মার্ট অভিনয় করেছেন। কৃত্রিম বলে ভ্রম হয় না। বিশ্বনাথ দে-র জারিজুরির ভঙ্গী প্রশংসনীয়। ত্রৈলোক্যের ভূমিকায় দেবাশীষ ঘোষ, কিশোর কল্লোল মুখার্জি চারিত্রিক মেজাজ-মর্জি রক্ষা করেছেন। শান্তি জানার হেমাঙ্গিনীকে যুগলমনির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বারেবারে হোঁচট খেতে হয়েছে। নীল অত্যাচারে জর্জরিতদের মধ্যে রবীন মুখার্জি, অশোক দাস শেষ পর্যন্ত রাশ টেনে রেখেছেন। গতি শ্লথ হতে দেননি।

নাটকীয় সংঘাত, দ্বন্দ্বে আলোক ও আবহসঙ্গীত কোনটিই প্রয়োগ নৈপুণ্যের দাবিদার নয়। মঞ্চকে আরও কিছুটা ইঙ্গিতধর্মী করলে পূর্ণতা আসতো। তবুও ভেক-ভণ্ডামীর সংস্কৃতির মাঝে 'আলোড়ন' অনেকাংশে প্রগতিশীল।

সমীরণ মুখোপাধ্যায়



'মেঘে ঢাকা তারা'—শমিতা বিশ্বাস ও পূর্ণিমা দত্ত

মেঘে ঢাকা তারা

প্রযোজনা: বৃত্ত। **উপদেষ্টা:** জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। **সঙ্গীত:** চন্দন রায়চৌধুরী। **নেপথ্য কণ্ঠে:** গৌতম মিত্র। **কাহিনী:** শক্তিপদ রাজগুরু। **অভিনয়:** যোগেশ মাইম, ২ নভেম্বর ৮০।

চলচ্চিত্রে ঋত্বিক ঘটকের প্রতিভার যাদুস্পর্শে যে কাহিনী বাঙালী দর্শকের চিত্তকে আলোড়িত করেছিল, সেই কাহিনীর মঞ্চে নাট্যরূপ কতটা সফল হলো? নাটক দেখতে দেখতে আমার মত হয়তো আরও অনেকেই এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন।—বাঙালী জীবনের মহত্তম ট্র্যাজেডী হলো উদ্বাস্তু-জীবন। সে ট্র্যাজেডী ঋত্বিক ঘটকের হৃদয়ে এক রক্তাক্ত সমবেদনার সৃষ্টি করেছিল। তাই ঋত্বিক ঘটক এক দুর্বল কাহিনীকে নিয়ে জীবনের গভীর বোধ থেকে তৈরি করেছিলেন মেঘে ঢাকা তারার মত চলচ্চিত্র। নাটকেও কাহিনীর অনেক দুর্বল অংশ ভরাটের চেষ্টা হয়েছে। নাটক পরিচালকের নাম নেই, আছেন উপদেষ্টা। বোধহয় এ নাটকে পরিচালকের কোন দরকার নেই, কারণ চলচ্চিত্রের ভাবানুষঙ্গে নাটক গতিময় হয়েছে। এমন কি চরিত্রগুলি চলচ্চিত্রানুগ।

কলোনী জীবনের পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে চায়ের দোকানের চরিত্রগুলি ও কয়েকটি দৃশ্য সত্যি অভিনব। হবু সিনেমা ডিরেকটার ও তার সাগরেদ চরিত্র দুটি বেদনার্দ্র নাট্যরসের রিলিফ হিসাবে কাজ করেছে। বংশী (শ্যামানন্দ দাশগুপ্ত) গুপী (চঞ্চল মুখোপাধ্যায়) দুজনেই যথেষ্ট সাবলীল।

নাটকের মূল চরিত্র নীতা (শমিতা বিশ্বাস) চেহারা ও চরিত্রে বিষাদ-প্রতিমায় মূর্ত। ছোট বোন গীতা (পূর্ণিমা দত্ত) স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। শংকর (রজতকুমার চৌধুরী) যথাযথ।

মা (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) এ নাটকের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। তার অভিনয় সমগ্র নাটকটিকে ধরে রেখেছে। উদ্বাস্তু-জীবনের বিষণ্ণ চালচিত্রে আঁকা এ মায়ের মুখ চিরন্তন প্রোজ্জ্বল। আলো ও শব্দ-প্রক্ষেপণ ত্রুটিমুক্ত হলে এ নাটক মঞ্চ সফল হবে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রেকর্ডিংগুলি আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল।

সুব্রত রাহা

রাজরক্ত

প্রযোজনা: মুখোশ। **নাটক:** মোহিত চট্টোপাধ্যায়। **অভিনয়:** ১৫ নভেম্বর ১৯৮০। রানাঘাট রবীন্দ্রভবন।

চারটি চরিত্রের নাটক রাজরক্ত। নাটকটির কেন্দ্রবিন্দু রাজাসাহেব, যিনি সবসময় মুখোশের আড়ালে। বিপরীতে ছেলেটি ও মেয়েটি। ছেলেটির হাতে অদৃশ্য ছুরি; (শেষ দৃশ্য প্রকাশ্যে) তাই দিয়ে রাজাসাহেবের মুখোশ খুলতে চায়। ছিঁড়তে চায়। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়। ক্রান্তিকাল এগিয়ে আসে। প্রয়োজন হয় রাজরক্তের।

চরিত্র-চিত্রণে ও স্বরক্ষেপণে রাজাসাহেবের ভূমিকায় চন্দন মুখোপাধ্যায় স্পষ্ট। অসামান্য দক্ষতায় সংলাপ ভুল করেও দর্শকদের বোকা বানিয়ে দিতে সমর্থ হন। বাচ্চু পাণ্ডের অভিনয়ে প্রাণ ছিল, ছিলনা আনুষঙ্গিক মনোযোগ। ছাত্রের ভূমিকাতেও মাথায় থেকে যায় প্রশাসনিক টুপী। ছেলেটির চরিত্রে দিলীপ আচার্য মোটামুটি, কিন্তু মেয়েটির ভূমিকায় কৃষ্ণা রায় ক্লান্তিকর।

অভিনয়ের পূর্বে অভিনেতাদের নাম মাইকে ঘোষিত হল; হলো না পরিচালকের নাম। রাজাসাহেবের মতই পরিচালক মুখোশের আড়ালে থেকে যান। আলো এবং ধ্বনির প্রতিও মনোযোগ দরকার ছিল। না হলে শাসনের সহকারী মাতাল অবস্থার মতই হাত নাড়তে হবে। কড়া নাড়ার শব্দ বাইরে থেকে ভেসে আসবে দেরিতে।

প্রীতিময় দে চৌধুরী

সংস্কৃতি সংবাদ

'প্রেস ফটোগ্রাফারস অ্যাসোসিয়েশন অব ইনডিয়া' (১২ নভেম্বর ১৯৮০) বিজয়া সম্মেলন করলেন শিশির মঞ্চে। ছিলেন নামী-দামী শিল্পীরা।

অংশুমান রায় লোকসঙ্গীতে অনেকদিন আগেই তাঁর নিজস্ব একটি পরিপাটী বাগান তৈরি করে ফেলেছেন। তারই কয়েকটি রঙিন ফুল সেদিন সন্ধ্যায় উপহার দিলেন। সুমিত্র রায় রবীন্দ্র-নজরুল দু' ধরনের গানই গাইলেন। তেমন জমাতে পারেননি। মার খেলো। তবু 'সেই ভাল করে বিনোদ বেণী—' উৎরেছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 'ও নদীরে', 'দিনের শেষে' গাইলেন। কিন্তু কোথায় তাঁর সেই উদাত্ত কণ্ঠ?

প্রশংসনীয় বাণী ঠাকুর। ধন্যবাদ তাঁকে 'একদা তুমি প্রিয়ে' গানটির জন্যে। কয়েকটি সুন্দর নজরুলগীতি উপহার দিলেন ধীরেন বসু। থরো থরো বিষাদ শ্রোতাদের অন্তর ছুঁয়ে গেল, যখন তিনি গাইলেন 'শাওন রাতে যদি—'।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ হাসিয়েছেন। ইলা বসুর উচিত পপ ঘেঁষা আধুনিক গান ছেড়ে নজরুল গীতিকেই আপন করে নেওয়া। কারণ তাঁর স্বরগ্রামে কারুকাজ অপূর্ব। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অশোক বসু।

সৌরেন মিত্র

ডিসেম্বর ১ থেকে ১৫

মেষ ঃ শরীর নিয়ে দুর্ভাবনা চলবে। সঞ্চয়ের আভাস, তবে বড় ব্যয়ও হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনে ঝামেলা। মেয়েদের কর্মস্থলে সামান্য ব্যাপার বিচলিত করবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে আপোষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার আশংকা। মিথ্যে কোন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা। কোন সন্তানের জন্য দুর্ভাবনা। কর্মহীনদের আকস্মিক সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার সম্মানহানি।

বৃষ ঃ আগের চেয়ে শরীর ভাল চলবে। আর্থিক ব্যাপারে ঝামেলা। কর্মস্থলে উত্তেজনা এড়িয়ে চলুন। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত সাময়িক অস্বস্তিতে ফেলবে। ব্যয় বাড়বে। পারিবারিক ক্ষেত্রে অন্যের মত প্রাধান্য পাবে। সহজ বিবাহযোগ। ভ্রমণের ঝুঁকি নেবেন না। গোপন বিষয় ফাঁস হবার দরুন মেয়েদের বিড়ম্বনা। ব্যবসায়ীদের স্থিতাবস্থা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার ক্ষতি।

মিথুন গলার রোগ কষ্ট দেবে। আর্থিক উন্নতির আভাস। সামান্য সঞ্চয়। কর্মক্ষেত্রে শত্রু বাড়বে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে স্বীয় প্রচেষ্টায় সাফল্য। বকেয়া টাকা সহজে পাবার ইংগিত। বন্ধুদের ওপর নির্ভর করা ঠিক হবে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে অনাত্মীয় ব্যক্তির নাক গলানোয় জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের সামান্য লাভ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে অসাফল্য।

কর্কট ঃ চলাফেরায় সাবধান ; পায়ে আঘাত লাগতে পারে। আর্থিক দুশ্চিন্তা চলবে। কর্মক্ষেত্রে হিসেব-পত্র ব্যাপারে সতর্কতা প্রয়োজন। মেয়েদের কর্মস্থলে অন্যের প্ররোচনা এড়িয়ে না চললে ক্ষতির আশংকা। পারিবারিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্য। প্রিয়জনের আচরণে ক্ষোভ। মেয়েদের প্রত্যাশিত কোন ব্যাপারে অসাফল্য। ব্যবসায়ীদের ঝুঁকি ভাবিয়ে তুলবে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার মানসিক ক্লেশ।

সিংহ ঃ ছোটখাট অসুস্থতা লেগে থাকবে। জমানো অর্থে টান পড়বে। কর্মক্ষেত্রে অসাফল্য ও শত্রুবৃদ্ধি। মেয়েদের কর্মস্থলে দ্বিধা সুযোগ নষ্ট করতে পারে। পারিবারিক কোন সমস্যার সমাধান হবে। মেয়েরা কাউকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করে ঠকতে পারেন। বাড়ি ক্রয় সংস্কারের প্রচেষ্টায় বাধা। প্রিয়জন বিয়োগের আশংকা। ব্যবসায়ীদের মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার অর্থনাশ।

কন্যা বায়ু বা পিত্ত সংক্রান্ত রোগ সামান্য ভোগাবে। আর্থিক ব্যাপারে সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে কোন উদ্দেশ্য রূপায়ণের মুখে বাধা। মেয়েদের কর্মস্থলে কোন ব্যাপারে গাফিলতি ক্ষতি করতে পারে। তৃতীয় কোন ব্যক্তির পরামর্শে আয় বৃদ্ধি। পারিবারিক ক্ষেত্রে দলাদলির মধ্যে জড়িয়ে পড়বার আশংকা। অবিবাহিত মেয়েদের বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা। জমি জমা ক্রয়/বিক্রয় ব্যাপারে স্ত্রীর প্রচেষ্টায় সাফল্য। ব্যবসায়ীদের ক্ষতি। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার লাভ।

তুলা ঃ পক্ষ মাঝামাঝি শরীর নিয়ে দুর্ভাবনা। আর্থিক ব্যাপারে ঝামেলা। ব্যয়ের চাপ চলবে। মেয়েদের কর্মস্থলে নতুন উদ্যম প্রশংসা পাবে। মোটামুটি আয় বাড়বে। পারিবারিক মামলা-মোকদ্দমা ভাবিয়ে তুলবে। ভাই-বোনেদের সংগে মনোমালিন্য। বন্ধুদের আচরণ মেয়েদের মানসিক কষ্ট দেবে। সন্তানের চোখ সংক্রান্ত পীড়া। ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগ লাভের হবে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার আশাভংগ।

বৃশ্চিক ঃ অর্শ রোগে কষ্ট পাবার সম্ভাবনা। আর্থিক প্রচেষ্টায় সাফল্য। কর্মস্থলে মানসিক চাপ। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়তার প্রয়োজন হবে। নানাভাবে আয় বাড়াবার সুযোগ। স্ত্রীর বিচক্ষণতায় কোন সমস্যার সমাধান। তবে স্ত্রীর ও সন্তানদের স্বাস্থ্য চিন্তার কারণ হবে। প্রতিযোগিতামূলক কাজে অসাফল্য। কর্মহীনদের যোগাযোগের ইংগিত। ব্যবসায়ীদের আয় বাড়বে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার দায়িত্ব বৃদ্ধি।

ধনু ঃ পুরনো রোগের অনেকটা নিরাময়। আর্থিক ব্যাপারে নৈরাশ্য। কর্মক্ষেত্রে সময় অনুকূল নয়। মেয়েদের কর্মস্থলেও নানাভাবে পিছিয়ে পড়বার সম্ভাবনা। প্রভাবশালী কোন আত্মীয়/বন্ধু ভুল বুঝবে : ফলে অসুবিধেয় পড়তে হবে। সম্পত্তিগত বিরোধ নতুন মোড় নেবে। কারও সম্পর্কে মেয়েদের মনের দুর্বলতা ক্ষতি করবে। ব্যবসায়ীদের ঋণের বোঝা বাড়বে। আর্থিক সংকট কাটিয়ে ওঠার সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হতে পারে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার নতুন উদ্যমে বাধা।

মকর ঃ শরীর ভাল। আর্থিক উন্নতির আভাস নেই। ব্যয়ের চাপ চলবে। কর্মক্ষেত্রে অসাফল্য। মেয়েদের কর্মস্থলে দীর্ঘসূত্রতায় সুযোগ নষ্ট হতে পারে। প্রবাসী প্রিয়জনের উপস্থিতি উৎসাহিত করবে। ভাই বোনের আচরণ ক্ষুব্ধ করবে। মেয়েদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও সম্মান। কর্মহীনদের উদ্যম সফল হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ক্ষতি। নতুন কোন আর্থিক উদ্যোগে অসাফল্য বিব্রত করতে পারে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার স্বজন বিরোধ।

কুম্ভ ঃ পেট সংক্রান্ত রোগ বেশ ভোগাবে। আর্থিক ব্যাপারে দুশ্চিন্তা। ব্যয়ের চাপ বিপাকে ফেলবে। কর্মক্ষেত্রে সুযোগ হাতছাড়া হবার আশংকা। মেয়েদের কর্মস্থলে দূরদর্শিতায় আংশিক সাফল্য। পারিবারিক ক্ষেত্রে অর্থ সংক্রান্ত কোন ঝামেলা ও মনান্তর। সন্তানের আচরণে দুশ্চিন্তা। মেয়েদের প্রেমে নৈরাশ্য। জমি-জমা ক্রয়-বিক্রয়ে ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। ব্যবসায়ীদের আর্থিক সংকট চলবে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার হতাশা।

মীন ঃ অজীর্ণ ভোগাতে পারে। আর্থিক উন্নতির আভাস। কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের জন্য প্রশংসা। মেয়েদের কর্মস্থলে সুহৃদের আচরণ ব্যথিত করবে। আত্মীয়/বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে কাজে বাধা। প্রিয়জনের অসুস্থতা। কর্মহীনদের ছোটখাট যোগাযোগ। ব্যবসায়ীদের আর্থিক সংকট। এই পক্ষের মাঝামাঝি সময় থেকে আর্থিক সমস্যার খানিকটা সুরাহা হবে। মেয়েদের নিজের মতে চলার চেষ্টা পারিবারিক অশান্তির কারণ হতে পারে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কাজে কর্মে নৈরাশ্য।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুণকুমার পাল কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩, (ফোন ২৪-৫৫২০), থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২, (ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২৬৬৯), থেকে প্রকাশিত

দস্যু মোহন ১৪

মূল কাহিনী : শশধর দত্ত   চিত্র কাহিনী : অলোক দত্ত
শিল্পী : পোলারিস



(চলবে)

